# কলকাতা নীলকণ্ঠ

সিদ্ধার্থ ঘোষ

# কলকাতা নীলকণ্ঠ

পরিবেশক

অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির   এ ১৮ এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলকাতা ৭০০ ০০৭

অন্বেষা   ৮৯এ, এন্ কে ঘোষাল রোড.   কলকাতা ৭০০ ০৪২

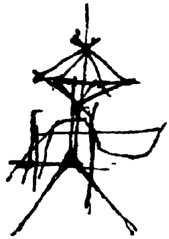
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬১

সাহিত্য ধারা

প্রকাশক। রমা ভট্টাচার্য
২৬ সেণ্ট্রাল রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩২

মুদ্রক। শ্রীশিশিরকুমার সরকার। শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৭

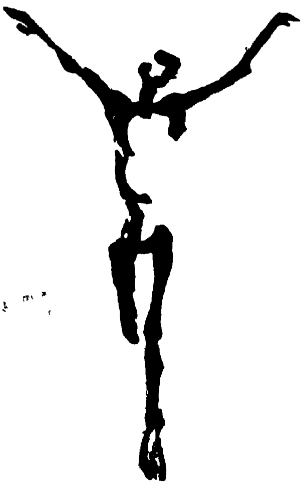
॥ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত বীরত্ব ও আদর্শনিষ্ঠা
যাদের প্রস্থানকে
তাদের ভয়ঙ্কর প্রবেশের মতোই করে রাখল চিরস্মরণীয় ॥






গল্পগুলি স্পন্দন, বারোমাস, চতুষ্কোণ, সত্যযুগ, লেখক সমাবেশ, শিস, প্রস্তুতিপর্ব, নান্দীমুখ, তরঙ্গ ও অনীক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বাঙলার গাঁয়ের বাতাস উড়িয়ে আনেনি
কোনো শহরের বীজ।
গঙ্গার পারে লোভ বুনেছিল ভিনদেশীরা।
জন্মাল জারজ কলকাতা।
জন্ম কারণেই কুৎসিত শিশু বেড়ে চলল,
শেকড় পাঠাল নীচে। অপরিচিত সে, তবু বঞ্চিত হল না
মাটির স্তন থেকে।
কলকাতার চরিত্রে তাই আসে প্রতিবাদ।
সেই পত্তনের কাল থেকে কলকাতা চলেছে সাদা কালোর
বৈপরীত্য নিয়ে। বিদেশী থেকে দিশী কর্তার
উৎপীড়ন ও ক্লীবের নিরাসক্তির সঙ্গে পাল্লা মেলায়
বেপরোয়াদের অবিনয়।
তবু ইতিহাসের সব সংবাদ মুছে যায় কলকাতা যখন
নীলকণ্ঠ হয়। সময়ের হিসেবে তখন
বিংশ শতাব্দীর
উনসত্তর থেকে ছিয়াত্তর।
আট বছর।
কিন্তু এ হিসেব তো রেখেছে ঘড়ির কাঁটা। আটপৌরে
সময়ের গড়পড়তা মাপ-জোখ।
কিন্তু নীলকণ্ঠ কলকাতার খতিয়ান দিতে পারে শুধু
একটা জ্যান্ত ঘড়ি যা আমাদের বুকের মধ্যে
ধুকপুক করে। সে কি বলে,
জানবার চেষ্টা করেছি। অনুভবে যা পেয়েছি
তাই রইল 'কলকাতা নীলকণ্ঠ'র পাতায়।
অনুভব ব্যক্তিগত, পাঠকেরা তাতে সামিল হলে
তবেই তা
সত্যের মর্যাদা পেতে পারে।



# জ ন ক

ঘুমটা ভেঙেও ভাঙছে না। অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে যেন আবছা একটা শব্দ। বার বার। শব্দটা ভারী নরম। পাতলা হয়ে আসা ঘুমের ওড়না ঠেলে কানে পৌছচ্ছে কিন্তু ধাক্কা দিচ্ছে না। একবার চোখ খুলল শ্রাবন্তী। আলোরা হইচই জোড়েনি এখনো। আবার চোখ বুজল। শব্দটা এখনো আসছে। এবার বুঝতে পেরেছে। শেঠ টমাসের বুড়ো ঘড়িটাকে শাসন করছে মেসোমশাই। এই বাড়ি তৈরি হওয়ার পর থেকেই বাইরের ঘরের দেওয়ালে ঘড়িটার মৌরসীপাট্টা। বয়স তার ষাটের কোঠা পেরিয়েছে। মেসোমশাইয়ের চেয়ে বয়সে বড়। মেসোমশাই এখন চেয়ারে চড়ে বাঁ হাতে ঘড়ির বুক টিপে ধরেছে। আর কাঁটা ঘুরিয়ে বাজনা মেলাচ্ছে। সময়ের হিসেব বুড়ো ঘড়িটা ঠিকই রাখে কিন্তু ন'টার সময় বারোটা বাজে বা ছ'টা। বাকবিভ্রম। রোজ মেলাতে হয়।

একটা হালকা মিষ্টি গন্ধ নাকে আসে শ্রাবন্তীর। মাসীমণি চান করে এল। চোখ না খুলেই বলে দিতে পারে। ছোটবেলায় গামছা ভুলে যেত শ্রাবন্তী। তখন গন্ধ শুঁকে ঠিক করত কোনটা কার। এখন আর পারবে কি-না বলা শক্ত। তবে মাসীমণির গায়ের মিষ্টি গন্ধটা এতটুকু বদলে যায়নি। ঘরে

ঢুকলেই টের পাওয়া যায়। ভীষণ হিংসে হত শ্রাবন্তীর প্রথমে। এই বাড়িতে আসার পর। তখন সে নেহাত ছোটটি নেই। কতদিন আর, বছর দশেক আগের কথা। মায়ের গায়ে তো কই অমন সুন্দর গন্ধ নেই। 'আমি মাসিমণির সাবান মাখবো।' এক দিন বায়না জুড়েছিল। মা, মাসী, মেসোমশাই—কেউ বোঝাতে পারেনি। নতুন সাবান এল। গন্ধ শুঁকে মেলানো হল জয়ার সাবানের সঙ্গে। কিন্তু শ্রাবন্তীর বিশ্বাস হয়নি। মাসীমণির সাবানের কৌটোর মধ্যে ওই ভিজে সাবানটাই তার চাই। প্রথমে কারণটা বলেনি শ্রাবন্তী। বলার পর সে কী হাসি সকলের। জয়া তার আতর এনে লাগিয়ে দিয়েছিল। তাতেও হয়নি। মাসীমণির তেল সাবান আতর ক্রিম—সব চাই।

সব মেখেও শ্রাবন্তীর শান্তি হয়নি। মা বলেছিল, 'ও কি এক দিনে হয়। জয়া শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসার পর থেকেই গন্ধটা—'। সত্যি, গন্ধটা মাসীমণির চামড়ার মধ্যে ঢুকে গেছে।

'কি গো রাজকন্যে, চোখ খুলুন এবার—'

মিষ্টি গন্ধটা এগিয়ে আসে। ঠাণ্ডা ভিজে গালের স্পর্শ পেয়েই শ্রাবন্তী চোখ খোলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভিজে চুল শুদ্ধু গলাটা।

'এত তাড়াতাড়ি চান করে ফেলেছ কেন?'

গালে গাল ঘষতে ঘষতে জয়া আঙুলে আদর নিয়ে শ্রাবন্তীর চুলের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতেই বলে, 'ওমা। সকাল কোথায়!'

জয়ার গলা জড়িয়েই চোখ খোলে শ্রাবন্তী। তবে কি মেঘ করেছে বলে··· তারপরেই মনে পড়ে যায় দক্ষিণের খোলা বারান্দায় বাঁশের মাথায় তেরপলের ছাউনি পড়েছে। সন্ধেবেলায় আজ অনেক লোক আসবে। আলো, ফুল, হাসিখুশি, গান আর খাওয়া দাওয়া—আর সব কিছুই শ্রাবন্তীর কারণে, শ্রাবন্তীকে নিয়ে শ্রাবন্তীকে ঘিরে। গা-টা শিরশির করে। ক'দিন আগে রুমার বিয়ে হয়েছে। সারাটা দিন কেমন হাসিতে মজাতে দুষ্টুমিতে ভাসতে ভাসতে পার হয়ে গেছল। কিন্তু সেটা ছিল রুমার বিয়ের দিন, রুমার বন্ধু হিসেবে দিনটাকে সে উপভোগ করেছে। রুমা কি করছিল সেদিন মনে করার চেষ্টা করে শ্রাবন্তী। সেদিনই রুমার মনটাকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত ছিল তার। তাহলে হয়তো আজ নিজেকে নিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারত।

শ্রাবন্তী বুঝতে পারছে না, আজ তার দায়িত্ব কি। শ্রাবন্তীর বিয়ের দিন শ্রাবন্তীর কাছে কি চায় সকলে? কিছু চায় কি?

'এবার ওঠা হক রাজকন্যার।' বলতে বলতেই শ্রাবন্তীকে দু'হাতের বাঁধন বেঁধে টেনে বসিয়ে দিল জয়া। নিজেকেও সেই সঙ্গে বসে পড়তে হয়েছে খাটের ওপর।

'ছাখ্, তুই এখনো আড়মোড়া ভাঙছিস তো, তোর রাজপুত্তুর হয়তো সারা রাত চোখের পাতাই এক করতে পারেনি।'

'যাও—সক্কাল বেলায় উঠেই ঠাট্টা ভাল লাগেনা। তুমিও আর সবার মতো করো না মাসীমণি—লক্ষ্মীটি!'

'সক্কাল কিরে! শ্বশুরবাড়ি গিয়েও এমনি বেলা করে উঠবি নাকি! ওঠ—ওঠ—'

শ্রাবন্তী উঠে পড়ল।

মাসীমণির এখন ঠাট্টা করার মতো মনের অবস্থা নয়। আর পাঁচজনের সামনে নিজেকে যাতে সামলে রাখতে পারে তার জন্যে এখন থেকেই সতর্ক করছে নিজেকে। শ্রাবন্তীর বিয়েতে আনন্দ দুঃখ ভাবনা—অনুভূতির সব স্তরেই মায়ের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ মাসীমণি। সেটাই গত দশ বছরের রীতি। সেই যেদিন মায়া আর শ্রাবন্তী এই বাড়িতে এল, তার পরের মুহূর্ত থেকেই জয়া আবিষ্কার করেছে, শ্রাবন্তীই তার জীবনের কেন্দ্র। ঘটনার পিছনে কারণ খুঁজতে চাওয়াই মানুষের ধর্ম। জয়ার নিঃসন্তান হওয়াটা তাই অনেককেই সন্তুষ্ট করে! তারা জানে না, জয়া মাতৃত্বের দাবি নিয়ে বোনের মেয়েকে গ্রহণ করেনি। মায়ের বিকল্প হতে চায়নি। মায়ের স্থান দখল করে নেবার মতো কোন আদিম অবচেতন নির্দেশের পুতুল হয়নি। চিরদিন মাসীমণি হয়েই থেকেছে। একটি রাতেও সে শ্রাবন্তীকে পাশে নিয়ে শোবার জন্য অধীরতা দেখায়নি। কিন্তু তারপরেও শ্রাবন্তীর জীবনে মাসীমণি অপরিহার্য। মা কাজে বেরিয়ে যায় সকাল ন'টায়। ফিরতে ফিরতে ছ'টা। ক্লাবের কাজ পড়লে আটটাও হয়। শ্রাবন্তীর জন্যেই জয়া তার চাকরি ছেড়েছে। সেটাও বড় কথা নয়। জয়া গানও ছেড়েছিল। অনুযোগ করেছে গুণমুগ্ধরা। জয়া তর্ক করেনি কোনদিন। উত্তর তার একটাই—তার জীবনে শ্রাবন্তীই সেরা গান। কেউ সন্তুষ্ট হয়েছে এই উত্তরে, অনেকেই হয়নি কিন্তু জয়া হয়েছে এবং সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। শুধু তাই নয়, শ্রাবন্তীর প্রয়োজনে জয়া যেমন

গান ছেড়েছিল আবার শুরুও করেছিল নতুন করে। শ্রাবন্তী তার যোগ্য উত্তরসূরী। প্রসঙ্গতঃ মেসোমশাই একদিন শেক্সপীয়ারের সনেট উদ্ধৃত করেছিল, 'বুঝলে জয়া, তুমি না থামালেও তোমার গান একদিন থেমে যেত ঠিকই। প্রকৃতির নির্দেশেই। আর থামবে না। তোমার গান এখন নতুন জীবন পেয়েছে শ্রাবন্তীতে—হ্যাঁ—

'দিস ওয়ার টু বি নিউ মেড হোয়েন দাউ আর্ট ওল্ড,
অ্যাণ্ড সি দাই ব্লাড ওয়ার্ম হোয়েন দাউ ফিলেস্ট ইট কোল্ড।'

বাথরুম থেকে জলের কোঁস-কোঁসানি কানে আসে। বেসিনের কল খুলেছে শ্রাবন্তী। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। জয়া উঠে গেল।

'শ্রাবন্তী! বালতিতে গরম জল রাখা আছে। একেবারে চান করে নিও।'

শ্রাবন্তী কিছু একটা বলল কিন্তু শোনা গেল না।

'কলটা বন্ধ করে বলো।'

'কাপড় জামা নিইনি—'

'আমি দিয়ে যাচ্ছি।'

শাড়ি ব্লাউজ দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল জয়া। মায়া পাশের বাথরুম থেকে চান করে এসেছে। ভিজে চুলের সঙ্গে তোয়ালে পাকাতে পাকাতে মায়া হাসছিল জয়ার দিকে তাকিয়ে।

'হাসছো যে?'

'হাসি এলে হাসব না!'

'হাসি এল কেন সেইটাই তো জানতে চাইছি। কি করলুম আবার?'

'করবি আর কি! আজও শাড়ি-ব্লাউজ যোগাচ্ছিস হাতে হাতে। কাল থেকে কি হবে শুনি।'

'কি আবার হবে? কাপড়-চোপড় কাচাকাচি আর সারাদিন ধরে রান্নাবাড়া করার জন্য নিশ্চয় বিয়ে দিচ্ছি না। ওগুলো করার জন্য মেয়ের অভাব নেই। সেকথা ওরা ভালভাবেই জানে। অমিতদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় একদিনের নয়, সব দেখে বুঝে নিশ্চিন্ত না হয়ে—'

'আরে দূর—ওকথা বলিনি। শ্রাবন্তী নয়, তোর কি হবে তাই ভাবছি।'

'ও, তাই বলো। হ্যাঁ, সেটা সত্যিই সমস্যা। আমি এখনো জানি না। ভাবতে পারছি না। কাল থেকে আমার পুরো ছুটি।'

শাড়িটা আলগা করে গায়ে জড়িয়ে ঘরে এসে ঢুকতে গিয়ে থমকে গেল শ্রাবন্তী।

'দিদি আজকে একটু কপালে সিঁদুর ঠেকাও।' মাসীমণির গলা। মাকে বলছে।

'অত আদিখ্যেতা আমার আসে না।'

'তা নয়, আজ একটা শুভদিন। ধর্মকর্মের কথা হচ্ছে না। তুমি জানো, আচার-বিচারের আমি পরোয়া করি না। তবু বোঝো তো কয়েক শতাব্দীর অভ্যাস। রক্তে মিশে আছে। মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে বাবা থাকছে না—'

'ধরে নাও না, সে নেই। যে নেই তার জন্যে—'

'দিদি, ওকথা বলো না—'

'কেন? কেন বলবো না? যে থেকেও নেই, তার জন্য আমার কোন মাথাব্যথাও নেই।'

'শ্রাবন্তীর কথাটা ভাবো। যতই হোক তার বাবা আজ—'

'শ্রাবন্তীর কথা ভাবি বলেই বলেছি। শুধু নিজের কথা ভাবলে হয়তো কোন অসুবিধেই হত না। জাহান্নামে গিয়েও তার সঙ্গে বাস করতে পারতাম। কপালে সিঁদুর জলজল করত। নিশ্চয়ই সেটা তুই—'

'না, না, তুমি ভুল বুঝোনা দিদি। তুমি জানো তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশী স্ট্রিক্ট। তাছাড়া এটাও তোমার মস্ত ভুল। শুধু কি শ্রাবন্তীর কারণেই তুমি এই ডিসিশান নিয়েছ? কক্ষণো নয়। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে অজয়দার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেই কি তার মন পেতে? তা হয় না। যে নিজের মেয়ের কথা ভাবে না, সে দেশের কথাও ভাবতে পারে না। ওসব ভড়ং—হয় না, হয় না। দুটো মানুষের মধ্যে, দুটো পরিবারের মধ্যে কালচারাল গ্যাপটা এত বড় হলে মিল হতে পারে না।'

জড়সড় হয়ে যায় শ্রাবন্তী। এখন ঘরে ঢোকা যতটা কষ্টকর, দাঁড়িয়ে থাকাও ততটাই। মা বা মাসীর নজরে পড়লে একটা লজ্জা মাখানো অস্বস্তি তিনজনেরই কণ্ঠরোধ করবে।

শ্রাবন্তী তবু সরে যেতে পারে না। শোনে।

জয়া বোঝাচ্ছে, 'ছাখো, সত্যিই যদি ব্যাপারটা ভুল বোঝাবুঝির হ'ত, সত্যি যদি অজয়দার কাছে তার আদর্শটাই এত বড় হত, মানে যে আদর্শের দোহাই তিনি দেন—তাহলে সে কখনোই আরেকটি মেয়েছেলের সঙ্গে—'

'না !' শ্রাবন্তী নীরবে একটা আর্তনাদ করে দরজার পাল্লাটা ধরে ফেলল। ধরে না ফেললে পড়ে যেতে পারত। মাসীমণির মুখে—

'—সে বাস করত না। তোমারও তো সমস্ত জীবনটাই ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। তার একার নয়। কই তোমার তো নতুন করে কারুর সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধার দরকার পড়ে নি। ওসব আদর্শ, জনগণ কিচ্ছু নয়—মুখের বুলি, আসল কারণ ওই মেয়েটা, ওই মেয়েটার জন্যই বাকী সব কিছু তৈরি করা হয়েছে—'

শ্রাবন্তী নিঃশব্দে ফিরে গেল বাথরুমে। একটা মুহূর্ত নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। ধাক্কাটা আচমকা। আলতো করে কলঘরের পাল্লাটা টেনে আনল। সন্তর্পণে তুলে দিল ছিটকিনি। ঠাণ্ডা ভিজে দেওয়ালটায় পিঠের ঠেস রেখেছে। চোখ বন্ধ। বুকটা আরো বাতাস নেবার জন্য ছটফট করছে। কয়েক মুহূর্ত পরে শরীরের জ্বালাটা কমে এল। আর উথলে উঠল অভিমান। মার ওপর, মাসীর ওপর, বাবার ওপরেও। মা না বলুক, মাসীমণি তো বলতে পারত। বাবার সম্বন্ধে যত কথা সবই তো মাসীমণি জানিয়েছে। একথাটা বলতে কি দোষ ছিল !

মাসীমণি শ্রাবন্তীকে নিয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা করেছে। শ্রাবন্তীকে গড়ে তুলেছে তার বাবার সমস্ত অনাচারের বিকল্প রূপে, আদর্শ জবাব হিসেবে। এটা মাসীমণির কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। শ্রাবন্তী জানে মাসীমণির কাছে এই লড়াই জীবনমরণের সমস্যা। তাতে শ্রাবন্তীর আপত্তি নেই। তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে হয়নি, কারণ তার ইচ্ছাগুলোকে ঠিক সময় মতো সযত্নে স্নেহভরে গড়ে তোলা হয়েছে। মনটাই তো ভাললাগা মন্দলাগা নির্ধারণ করে। সেই মনটা তার গড়ে উঠেছে শান্ত সুন্দর পরিবেশে। শান্ত আর সুন্দরের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করার জন্য তাকে সচেষ্ট হতে হয় না, কোনো নিষেধ নির্দেশ পালন করতে হয় না। কাজেই, আজ সে যেটা শুনল, মানে শুনে ফেলল, সেটা তাকে আগেই বলা উচিত ছিল। না বলে ঠিক করেনি মাসীমণি।

একটা যন্ত্রণা মাথার পিছন থেকে ঘাড় বেয়ে কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। ঘাড়টা বেঁকিয়ে মুখটা উঁচু করল। কলঘরের উঁচু জানলার পাল্লার ওপর

আড়াআড়ি দুটো কাঠ আঁটা পেরেক ঠুকে। মেঝে ছাপিয়ে মাঝ দেয়াল অবধি মোজেক উঠেছে, তারপর সাদা ডিস্‌টেমপার। কলঘর হলেও কোথাও এতটুকু ঝুল নেই, মালিন্য নেই। এর মধ্যে একেবারেই বেমানান ওই জানলার পাল্লায় আটকানো রঙহীন রুক্ষ দু'ফালি কাঠ। ঠিক যেমন বেমানান তার বাবা এ-বাড়িতে। আর সত্যিই ওই কাঠ দুটোর সঙ্গে তার বাবার একটা সম্পর্ক আছে। বাবার কারণেই জানলায় কাঠ আঁটা হয়েছে। বাবার আসা-যাওয়া বন্ধ করার জন্য। শ্রাবন্তীর হাসি পায় অথচ এখনো চোখের কোণে জল শুকোয়নি। কলঘরে ঢুকে জানলাটার দিকে তাকালেই তার হাসি পায়। দু'বছর আগে বাবা কলঘরের এই জানলা গলে বাড়িতে ঢুকেছিল শ্রাবন্তীর জন্মদিনে। বছরে বাবার সঙ্গে এই একবার দেখা হয় শ্রাবন্তীর। এই নিয়মের কখনো ব্যতিক্রম হয়নি। সবাই বাধা দেবার চেষ্টা করে হার মেনেছে। তবে সেবারের কথা স্বতন্ত্র। বাবার খোঁজে পুলিশ তিন বার হানা দিয়ে গেছে। সত্তরের কলকাতা। পুলিশের ডি সি সাউথের সঙ্গে মেসো-মশাইয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মা-কে সাদা সিঁথি দেখিয়ে পুলিশকে বোঝাতে হয়েছে যে ফেরারী আসামীর সঙ্গে তিনি কোনো সম্পর্ক রাখেন না। তিনি সরকারী অফিসের কর্মী। বাবার রাজনৈতিক মতাদর্শকে স্বীকার করেন না। কেউ ভাবেনি এর মধ্যেও বাবা আসবে। পুলিশও নয়। একা শ্রাবন্তী জানতো, বাবা আসবেই। বোসেদের বাড়ির রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে উঠে, বাথরুমের জানালা গলে···মাসীমণির মুখ দিয়ে কথা সরেনি। মা সরে গেছল। পুলিশের কালো গাড়ি আসছে কি-না দেখতে মেসোমশাই বারান্দায়। বাবা চলে যাবার পর একটাই শব্দ উচ্চারণ করেছিল জয়া—ক্রুট্‌! তারপর প্রসঙ্গটা অশালীন জ্ঞানে সবরকম আলোচনা থেকে সরিয়ে রাখার নির্দেশ জারি করা হয়েছিল নিঃশব্দে। শ্রাবন্তীর তবু হাসি পায়। বাবা সত্যিই ক্রুট্‌! কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও সত্যি যে এই ক্রুট্‌-শক্তিকে ঠেকাবার সাধ্য নেই কারুর। এটা নিয়ে গর্ব করার কিছু আছে কি-না জানেনা শ্রাবন্তী। কিন্তু ভাবতে ভাল লাগে, তার জন্মদিনে বাবা আসবেই। গত বছরেও বাবা এসেছে। বাড়িতে দেখা করার উপায় ছিল না। দেখা হয়েছিল কলেজে। এক প্রফেসার বন্ধুর কক্ষে নিভৃতে আধঘণ্টা কাটিয়ে গেছে শ্রাবন্তীর সঙ্গে।

শ্রাবন্তী সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতেই আবার মনে পড়ে, মা মাসী বাবা সবাই তার কাছ থেকে একটা কথা গোপন

করেছে। শ্রাবন্তী অবাক হয়ে যায়। বাবার ওপরই যেন বেশী অভিমান জমছে। যার সঙ্গে বছরে একদিন দেখা হয়, যার সঙ্গে প্রায় দুর্ঘটনামূলক রক্তের একটা সম্পর্ক তার ওপর অভিমান করার কোনো মানে হয় কি! বাবার ওপর তার যে একটা দাবী আছে সেটা শ্রাবন্তীও বোধ হয় বোঝে না। মনে মনে সে স্থির করে নেয়, আজ বাবাকে সে ছাড়বে না। জিজ্ঞেস করবেই। বাবার তো বলা উচিত ছিল। কলঘরের ছিটকিনি খুলে বেরোতে বেরোতেই প্রশ্নটাকে গুছিয়ে নেয়। অভিমানের জায়গায় শ্রাবন্তীর মনে একটা কৌতুহল তৈরী হচ্ছে। বাবা যার সঙ্গে থাকে কেমন তিনি? তাঁকে দেখতে ইচ্ছে করছে শ্রাবন্তীর। মায়ের পাশে দাঁড় করাতে। বাবাকে সে বলবেই—কেন জানাওনি এতদিন? বাবা এলেই বলবে। আর বাবা যে আজ আসবেই সে সম্বন্ধে তার ছিঁটেফোঁটা সন্দেহ নেই।

শ্রাবন্তী গুটি গুটি পায়ে বারান্দায় এল। মেসোমশাই জলখাবারের পালা শেষ হতেই বারান্দায় এসে বসেছে।

'আয় শ্রাবন্তী। বসবি? রোদ্দুরটা বেশ ভালই লাগছে। সকালটা এখানে বসেই বই পড়ে কাটিয়ে দেব ভাবছি। বাড়ির ভেতর ঢুকলেই দুশ্চিন্তা। আমি আর আজ কিছু ভাবতে রাজী নই। তোর মা মাসী বড়মামা তো আছে—বল্!'

মেসোমশাই শ্রাবন্তীর হাতটা ধরল। মেশোমশাইয়ের চোখে চশমা দেখে অবাক হল শ্রাবন্তী। বই পড়ার জন্য তো চশমা লাগে না, তবে কি? শ্রাবন্তী বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চালিয়ে নিঃসন্দেহ হল। এখানে বসে সদর দরজাটা দেখা যায়। গলি দিয়ে মানুষজনের চলাচলের ওপর নজর রাখছে মেসোমশাই! বাবা যে আসবে সেটা মেসোমশাই আন্দাজ করেছে। কিন্তু এত ভয় কিসের? বাবা এলেই বা কি? অমিত তো সব জানে। বলা হয়নি একটাই কথা। অমিত বোধ হয় ধরে নিয়েছে শ্রাবন্তী বছর দশেক তার বাবাকে দেখেনি। মাসীমণি বারণ করেছিল শ্রাবন্তীকে। অমিত খুব সেন্টিমেন্টাল। মনটা তার ভারী নরম। হঠাৎ যদি কোনো সফ্ট কর্নার তৈরি হয়, কে জানে তখন হয়তো বলে বসবে বিয়ের আগে তাঁর শুভাশীষ নেওয়াটা অবশ্য কর্তব্য। অমিত খুবই ভদ্র ছেলে কিন্তু জেদ তার ভয়ানক। শান্তিনিকেতনে বছর আষ্টেক কাটিয়েও রায়বাহাদুর

ঠাকুর্দার কাছ থেকে অর্জন করা উত্তরাধিকার মলিন হয়নি। জয়া একথা ভাল করেই জানে কারণ অমিতদের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বের সম্পর্কটার বয়সও প্রায় দুই পুরুষের। কিন্তু বাবা যদি আসেন মেসোমশাই কি বারান্দায় বসে দৃষ্টি রেখেই—অসম্ভব! এই জন্যেই তো বিয়ের কথাটা গোপন রাখতে চাওয়া হয়েছিল। মায়ের ভুলে সেদিন যখন—ওই একবারই মাসীমণিকে রাগতে দেখেছে শ্রাবস্তী। জয়ার গায়ের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই যেন দেহটা তার কোমল আর বৃত্তাকার কিছু রেখার সমন্বয়। কোনো কারণে উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত হলেও কপালে বা ভুরুতে কর্কশ রেখা জন্মায় না।

সেই জয়াই বলেছিল, 'দিদি তোমার মাথার ঠিক নেই। ছি ছি—কি দরকার ছিল তোমার ওদের সঙ্গে অত কথা বলার! যা ভয় করেছিলাম তাই হল—কথাটা এবার ঠিক অজয়দার কানে যাবে।'

মায়া মাথা নিচু করে নিয়েছিল। প্রতিবাদ করেনি। ভুল তো সত্যিই হয়েছে। তিনটে ছেলে মায়ের অফিসে গিয়েছিল দেখা করতে। মায়ের কাছে বাবার লেখা কোন চিঠি আছে কিনা খোঁজ করেছিল। ওরা নাকি বাবার লেখা নিয়ে একটা সংকলন বার করবে। মা বলেছিল, কোনো সম্পর্কই নেই যার সঙ্গে···ছেলেগুলো নিরস্ত হয়নি। ৪২-এর মুভমেণ্টের সময় বাবার সঙ্গে মায়ের প্রথম পরিচয় ও সেই সূত্রেই বিবাহ। ৪৭-এর আগে তাঁদের সম্পর্কে কোনো বড় রকম সংকট দেখা দেয়নি। ছেলেগুলো সব খবরই জানতো। সাতচল্লিশের আগে (যাকে মা বলে স্বাধীনতা আর বাবা বলে স্বাধীনতার ধাপ্পা) জেল থেকে সত্যিই বেশ কিছু চিঠি লিখেছিল বাবা। সেই চিঠিগুলোর খবর ওরা যখন জানত, নিশ্চয় পার্টির ছেলে এবং বাবার খুব ঘনিষ্ঠও। হয়তো বাবাই ওদের—মা আর ধৈর্য রাখতে পারেনি, 'তোমরা কি আমাকে এতটুকু শান্তি দেবে না? আমার সঙ্গে তাঁর একটা সম্পর্ক আছে জোর করে প্রমাণ করে ছাড়বে! সে কোন্ যুগে কি লিখেছিল, সেগুলো আমার কাছে কোন অমূল্য সম্পদ নয় সে সিন্দুকে ভরে সযত্নে রক্ষা করব। কয়েক বছর আগে শুধু সন্দেহের বশে আমায় অফিস থেকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। সে কথা জানো? তোমরা কি চাও আবার আমি···আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি—'

'না না! তা নয়! আমরা আর কখনো আসব না। না এসে যে···

জানতাম হয়তো, আপনার কাছে কিছু নেই, তবু এটা আমাদের দায়িত্ব। অজয়দার স্মৃতি রক্ষা—'

আর সহ্য করতে পারেনি মায়া। স্মৃতি রক্ষা! অজয়ের মৃত্যুর খবর এর আগেও বার তিনেক অন্তত এসেছে গত তিন বছরে। আসলে সেন্টিমেন্টে ঘা দেওয়া। প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে হাত জোর করে মিনতি করেছিল মায়া, 'দোহাই তোমাদের, বিশ্বাস করো আমার কাছে কিছু নেই। বিশ্বাস করো। আমি তো কিচ্ছু চাই না তোমাদের কাছে। শুধু আমার মেয়েকে নিয়ে আমায় একটু সুস্থ ভাবে শান্তিতে বাঁচতে দাও। আজ বাদে কাল তার বিয়ে—'

অকারণে উত্তেজিত হয়নি জয়া। সেদিনের পর থেকে এ বাড়ির সকলেই বুঝেছে যে শ্রাবন্তীর বিয়ের দিন সেই মহাপুরুষের পদধূলি পড়বেই। আনন্দের আয়োজনে অনুক্ষণ কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে চিন্তাটা। লোকটা এখনো ওয়ান্টেড। বলা যায় না পুলিশও হয়তো ওত পেতে থাকবে। শেষে বিয়ের দিন যদি রেড্ হয়—ভাবা যায় না।

ভেতরের ঘর থেকে মাসীমণি ডাকছে।

'শ্রাবন্তী, তুই বরং বইগুলো দেখেশুনে ট্রাঙ্কে পুরে রাখ এই বেলা। আমি গুরুদেবের ছবিটা পরিষ্কার করে ফেলি—'

'তুমি বই তোলো, আমি ছবিটা পরিষ্কার করছি।' শ্রাবন্তী ঘরে এল।

চেয়ার টেনে রবীন্দ্রনাথের অয়েল পেন্টিঙটা নামিয়ে আনল। শক্ত ভারী ছবিটা। আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসর বসবে। ছবিটাকে সাজিয়ে রাখা হবে। মাস্টার মশাই আসবেন। তিনি শান্তিনিকেতনের মানুষ। স্নেহভাজন কন্যাসমা ছাত্রী জয়ার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে কলকাতায় এসেছেন।

তুলোর থুপিতে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখের ময়লা সরায় শ্রাবন্তী। এই শ্মশ্রুধারী ফ্রেমে বাঁধানো মানুষটিকে মাঝখানে রেখে জয়া লড়াইটা জিতে গেছে। শ্রাবন্তী যখন প্রথম জানতে পারে যে তার বাবা রবীন্দ্র সংস্কৃতিকে অস্বীকার করে, বাবার পার্টির ছেলেরা রবীন্দ্রনাথের ছবিকেও খানখান করে দিয়েছে স্কুল পুড়িয়ে বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা নিপাত করার সময়, ততদিনে রবীন্দ্রনাথ অপরিহার্য হয়ে পড়েছেন শ্রাবন্তীর জীবনে। গানে নৃত্য-নাট্যে কবিতাপাঠে সে স্কুল জীবনের নিচু ক্লাশ থেকেই অংশগ্রহণ করেছে। জয়া নিজে তাকে পিয়ানো বাজিয়ে গান শিখিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে

শ্রাবন্তীর সুরের জগতের ভিত্তিটাই ধ্বসে পড়ে। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে পরাস্ত করার কোন সুযোগই পায় নি বাবা। তাছাড়া সেরকম কোন চেষ্টাও তিনি করেন নি। ক'বছর আগে তার জন্মদিনে শ্রাবন্তী বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'রবীন্দ্রনাথকে তুমি পছন্দ করো না কেন বাবা? আমার তো খুব ভাল লাগে।'

'তোমার ভাল লাগাটাই তো স্বাভাবিক শ্রাবন্তী। কিন্তু সবার ভাল লাগার মতো অবস্থা এখনো তৈরি হয়নি। তুমি যে পরিবেশে বড় হয়ে উঠেছ সবাই তো সে পরিবেশ পায় না। আমরা সেই পরিবেশটাই তৈরি করতে চাই সবার আগে।'

শ্রাবন্তীর হাতের তুলোটা বেশ ময়লা হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের মুখে এত ধুলো!

বাবার মতামত মেনে নিতে পারেনি শ্রাবন্তী। কিন্তু তা বলে বাবাকে বুঝতে তার কোন অসুবিধে হয়নি। মনে পড়ে, সেদিন একটা মাছি ভনভন করে বিরক্ত করছিল। হঠাৎ এক থাপ্পড়ে সেটাকে মেরে টেবিলের ওপর ঝেড়ে ফেলে দিল বাবা। গা-টা কেমন ছমছম করে উঠেছিল তার। মাসীমণি 'হরিবল্' বলে চলে গেল। বাবা কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে নি। শ্রাবন্তী বলল, 'হাতটা ধোবে?'—'কেন?'—'মাছিটা মারলে…' এবার বাবা হেসেছিলেন। সেই দেবব্রত বিশ্বাসের গানের মতো হাসি। বাবার চিন্তা-ভাবনা বা জীবনযাপন, কোনটাই শ্রাবন্তীকে আকর্ষণ করে না। কিন্তু বাবা করে। কিংবা, হাতের শির-ফোলা একটা খোলামেলা রুক্ষতা তাকে আকর্ষণ করে। পৌরুষ। শ্রাবন্তীর জীবনে বাবাই সবচেয়ে রহস্যময় ব্যক্তিত্ব। কলেজে প্রফেসারের ঘরে শ্রাবন্তী সুযোগ পেয়েছিল নিভৃতে প্রশ্ন করার, 'বাবা, আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, সব জেনেশুনে তুমি আর মা কেন…'

প্রশ্ন শেষ করতে হয় নি। 'সব জেনে শুনে নয় শ্রাবন্তী। সাতচল্লিশের আগে বড়লোক ছোটলোক বিভেদটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। ভাবতে পারো বিয়াল্লিশের মুভমেণ্টে তোমার মা রাস্তায় নেমেছিল, মিছিলে স্লোগান দিয়েছিল, হাত মুঠো করে—হ্যাঁ, শত্রু ব্রিটিশ বলে গান্ধীভক্ত রবীন্দ্রপ্রেমীরাও তখন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল ঘরের শত্রুর বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি উচ্চারণ করতেও তারা নারাজ।'

শ্রাবন্তী মাথা হেঁট করে বসেছিল। মিনিট খানেক দু'জনেই চুপচাপ। তারপরে বাবা বললেন, 'তুমি আমায় ভুল বুঝো না। তোমার মায়ের প্রতি

আমার কোন অভিযোগ নেই। তাঁর পথ আমার পথ থেকে আলাদা। লোকে বলে অ্যাডজাস্ট করে চলার কথা কিন্তু মিথ্যের সঙ্গে বাস করেও স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে বাধ্য হবার মতো অভিশাপ দুটো নেই। সেই অন্যায় আমরা করি নি। এই সততারও একটা মূল্য আছে সেটা তুমি বুঝতে পারবে একদিন। আসল কথাটা কি জানো, তোমার মা তোমাকে যেভাবে ভালবাসে তার কোন তুলনা নেই। সে ভালবাসার হাজার ভাগের এক ভাগও তোমাকে আমি দিতে পারি না। তোমার মায়ের জীবনে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু তোমার কথা ভাবতে পারলেই তোমার মা নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। তুমি নিশ্চয় জানো তোমাকে নিয়েই—'

হ্যাঁ। বাবার বিরুদ্ধে মা ও মাসীর সবচেয়ে জোরালো অভিযোগ এইটাই। নিজের মেয়ের দিকেও তাঁর এতটুকু নজর নেই। একটা শিশুর জীবন নিয়ে খেলা। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। নিজের ঘর যে সামলাতে পারে না সে করবে জগৎ সংসারের উপকার।

এসব বিতর্কের বিষয়। নিজেকে ন্যায় অন্যায়ের বিচারকের পদে বসাবার মতো বয়স হয়নি শ্রাবন্তীর। শ্রাবন্তী এটাই বোঝে যে বাবা আর যাইহোক মনটা তার উদার। শ্রাবন্তী যদি আজ তার বাউণ্ডুলে বাবার অনুগামিনী হয়, তার মা বা মাসী হয়তো শয্যা নেবে কিন্তু ভুলেও তার জন্মদিনে দেখা করবার জন্য ব্যাকুল হবে না।

চমকে গেল শ্রাবন্তী। কলিং বেলের শব্দ। ছুটে এল বারান্দায়। মেসোমশাই রেলিঙের ওপর দিকে ঝুঁকে রয়েছে।

'দাঁড়াও—খুলে দিচ্ছি।' মেসোমশাই পিছন ফিরলেন। 'শ্রাবন্তী—তোর ছোট মামা।'

শ্রাবন্তী নিচে নেমে এল দরজা খুলতে। যত বেলা বাড়ছে, অস্থিরতাকে বাড়িয়ে তুলছে প্রত্যাশা।

ছোটমামাকে ওপরে যেতে বলে শ্রাবন্তী একতলার বারান্দায় বেরিয়ে এল। ছোটমামা আগে চলে যাক। সদর দরজাটা আলগা করে ভেজিয়ে রেখে দেবে। ছিটকিনি তুলবে না। বাবাকে প্রশ্নটা না করা অবধি স্বস্তি নেই। কেন গোপন করেছে কথাটা? বাবা মিথ্যে কথা বলতে পারবে না। সত্যিই কি ওই ভদ্রমহিলাকে ভালবাসে বলেই বাবা বাড়ি ছেড়েছে, না বাড়ি ছাড়ার পর···ক্লান্ত লাগে শ্রাবন্তীর। কথাটা কানে আসার পর প্রথম প্রতি-

ক্রিয়ার ঝাঁঝটা কমে এসেছে। বাবার ছবির পাশে আরেকটা ছবি ফুটিয়ে তোলার নিয়ত চেষ্টা করে চলেছে কিন্তু মেলাতে পারছে না। সন্তুষ্ট হচ্ছে না। কেমন দেখতে তাঁকে, কি করেন, শ্রাবন্তীর কথা কি বাবা তাঁকে বলেছে। একটা অদম্য কৌতূহলে শ্রাবন্তী অস্থির। বাবা একটু তাড়াতাড়ি আসছে না কেন আজ?

শেঠ টমাসের বুড়ো ঘড়িটা ঢঙ ঢঙ করে উঠল তিন বার। বয়সের শ্লেষ্মা জমা ঘড় ঘড়ে শব্দে। আশ্চর্য, আজ আর ওর কোন ভুল হচ্ছে না। এখন ঠিক তিনটেই বাজে। শ্রাবন্তী উঠে দাঁড়াল। বাড়ির সকলে খেতে বসেছে, নিচের দরজাটা যদি বন্ধ থাকে!

'কি রে যাচ্ছিস কোথায়?' মা প্রশ্ন করল।

'না—দেখে আসছি, নীচের দরজাটা বন্ধ আছে কি-না।'

'আমি বন্ধ করেছি।' মামাতো ভাই খোকা জানাল।

'তোর যা খেয়াল! কোন বিশ্বাস নেই!'

শ্রাবন্তী নেমে এল। দরজা খুলে বাইরের বারান্দার গেটের ধারে এসে দাঁড়াল। ঠিক এই মুহূর্তে যদি বাবার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়…কেন যে আসছে না এখনো! সন্ধে বেলা থেকেই তো শুরু হয়ে যাবে অবিরাম আনাগোনা। এক মুহূর্ত ফুরসত পারে কি তখন। তাছাড়া…নাঃ, সেটা কোন কথা নয়। বাবা এলে কেউ তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না…।

সন্ধে এল। লোকজন আসা শুরু হল। সানাই বাজল। শ্রাবন্তী সাজল। বাবা এলেন না। একটা কোলাহল ক্রমশ ঘিরে ধরছে তাকে আর তার মাত্রা বাড়ছে। বাড়ছে চারপাশে আলোর উজ্জ্বলতা। বাড়ছে আড়ষ্টতা, বাড়ছে হাসবার—শুধুই হেসে উত্তর দেবার তাগিদ। বাবা আসেননি এখনো।

মাস্টারমশাই এলেন। ধূপের ধোঁয়া কাঁপিয়ে সুরের লহরী বইল। রজনীগন্ধার সাদা পাহারার মধ্যে মালাবন্দী রইলেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রাবন্তী শুনল, গাইল, ভাল লাগল। কিন্তু সে এখন নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো মাটিতে পা রেখেও সাঁতরে বেড়াচ্ছে কিংবা হাওয়ায় ভাসছে। সব শব্দই কানে আসছে কিন্তু শুধু একটি কণ্ঠকে চেনবার জন্য সে উদগ্রীব। সবার মুখ চোখের

পর্দায় ভাসছে কিন্তু একটি মুখকে দেখবার জন্য তার চঞ্চলতা। বাবা এখনো এলেন না।

মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠল। ঘর ফাঁকা করে কেউ ছুটল বারান্দায়, কেউ এক তলায়। শ্রাবন্তী একা বসে রইল কয়েক মিনিট। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এই প্রথম সে একা হল। বাবাও কি তাহলে…সমস্ত শরীরটা যেন তৃষ্ণার্ত। হাঁ করে অনেকটা শ্বাস নেয়। শেঠ টমাসের বুড়ো ঘড়িটা আবার জানান দেয়, সে আছে, চলছে এবং আজ রাতে সময়ের মাপে ভুল হচ্ছে না। সাতটা বাজল, বাবার দেখা নেই।

ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশের আলো চমকে দিল শ্রাবন্তীকে। অমিতকে পাশে নিয়ে তার ছবি তোলা হল। আরো হবে। বিভিন্ন ভঙ্গিতে। অমিত এখন তার পাশে দাঁড়াবার সামাজিক অনুমোদন লাভ করেছে। কিন্তু ফটোগ্রাফে যদি শুধু মনের ছবি ধরা পড়ত তাহলে এই ছবিটাতে অমিতের পাশের অংশে অহেতুক শূন্যতা থাকত। ফটোগ্রাফারকে আনাড়ী মনে হত, একজনের ছবি তোলার জন্য নেগেটিভের অর্ধেকটা ফ্রেম ফাঁকা রেখে নষ্ট করার জন্য। ফ্ল্যাশের ঝলসানির সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবন্তীর মনে হয়েছে, সারা দিনের মধ্যে এই প্রথম, বাবা হয়তো আসবে না। কিন্তু কেন? খবর পায়নি? বিশ্বাস করা যায় না। শ্রাবন্তী নিজের সঙ্গে তর্ক করে। এখনো সময় আছে। বাবা নিশ্চয় আসবে। তাছাড়া বাবা তো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছে না।

বর বউকে নিয়ে বাড়ির লোকে খেতে বসল। শ্রাবন্তী মুখে গ্রাস নিয়ে বসে থাকে। গ্রাসাস্বাদনের প্রক্রিয়াটাও যেন খুব কোলাহল সৃষ্টি করছে। যদি কোন প্রয়োজনীয় শব্দ শুনতে না পায়।

পরিবেশকে সম্পূর্ণ বর্জন করেই শ্রাবন্তী খাওয়া সারল, হাত মুখ ধুয়ে ফুলের জলসায় এসে বসল। শ্রাবন্তী এখন দুটো সত্তায় যুগপৎ বিরাজ করছে। তার একটা ব্যবহারিক, অন্যটা মানসিক। সম্পূর্ণ সংযোগ-রহিত দু'টি সত্তা দু'টি ভিন্ন নির্দেশ ও ইচ্ছা অনুসারে চালিত হচ্ছে।

শ্রাবন্তী তবু আশা ছাড়েনি। বাবা আসবে না কেন? কি কারণ থাকতে পারে না আসার। সে বুঝতে পারে না। তাই আশাও ছাড়তে পারে না।

একে একে সকলে ঘর খালি করে চলে যাচ্ছে। স্থূল লোকাচারকে এই পরিবারে হিন্দুধর্ম জ্ঞানে পালন করা হয় না। বাসর ঘরে নবদম্পতির সঙ্গে বিনিদ্র রাত জাগার বা পরস্পরকে জাগিয়ে রাখার রেওয়াজ নেই। সবার শেষে বেরিয়ে গেলেন মাসীমণি। দু'হাতে অমিতের মাথাভরা কালো চুলে অজস্র আশীর্বাদ ঢেলে দিয়ে। যা আস্থা স্থাপনের ও সেই মর্মে একটি নীরব বিজ্ঞপ্তির প্রকারান্তর। দরজার পাল্লাদুটো বন্ধ হয়ে এল যেমন সিনেমার গতি কমিয়ে হরিণের লাফকে দীর্ঘায়ত করা হয়। বন্ধ দরজার পিছনে কোন কৌতুক অপেক্ষা করছেনা—এটা শ্রাবন্তীও জানে, অমিতেরও অজানা নয়। ওদের আর কোন শত্রু নেই এখন। আর নেই বলেই বোধ হয় সুখকে সামনে নিয়ে দাঁড়িয়েও দু'জনেই নির্বাক। নিজেদের মধ্যে এক হাত মাত্র পরিসরের বাধা অতিক্রম করেও হাত ধরতে পারে না দু'জনে।

শেঠ টমাসের বুড়ো ঘড়িটা আবার বাজছে। দুটো দেওয়াল পেরিয়েও তার কাতর কণ্ঠ কানে আসে শ্রাবন্তীর। এক দুই তিন চার·· লোলচর্ম অশীতিপর বৃদ্ধ যেন শ্লেষ্মার বাধা অতিক্রম করে কাশছে আর দম নিচ্ছে··· সাত আট নয় দশ···শতায়ু লাভের বাসনা আমৃত্যু পোষণ করাই বুঝি জীবনের ধর্ম···এগারো বারো। বারোটা! ঘড়িটা আজ সারাদিন বিশ্বস্ত থেকেছে। দিনটা পার হয়ে গেছে।

নতুন দিনে পৌছেই সমস্ত গা-টা গুলিয়ে উঠল শ্রাবন্তীর। ঢোঁক গিলে ওয়াকটাকে ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়াল। অমিত কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই দরজা খুলে বেরিয়ে গেল! সোজা কলঘরে।

দরজাটা টেনে দিয়ে তার ওপরে পিঠের ভর রেখে দাঁড়াল। দেহে এমন শক্তি নেই যে ছিটকিনিটা তুলে দেয়। আবার ওয়াক উঠল। শুকনো জ্বালায় শরীর জ্বলছে। 'বাবা! বাবা! তুমি সত্যিই এলে না বাবা!' শ্রাবন্তীর শরীরটা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ আর্তনাদে ফেটে পড়ল। শ্রাবন্তী কলের মাথাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করেও আস্তে আস্তে বসে পড়ে। 'না! না! আমি জানি বাবা আর কোনদিন আসবে না। বাবা নেই। যে নেই, সে আর আসতে পারে না!'

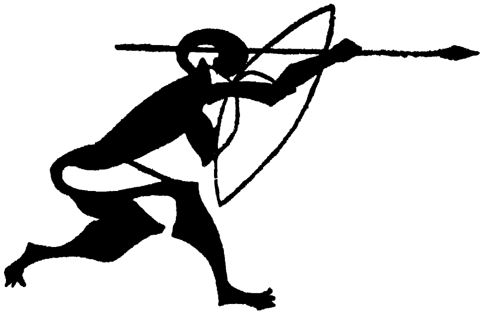
'শ্রাবন্তী। শ্রাবন্তী!' বাইরে মাসীমণির গলা। মা মেসোমশাই—সকলেই ছুটে এসেছে। ঠেলা পড়তেই দরজা খুলে গেল।

শ্রাবন্তী মুখ তুলল, 'তোমরা সবাই হেরে গেছ! সবাই। বাবা তোমাদের হারিয়ে দিয়েছে। তোমাদের সব অভিযোগ মিথ্যে!'

শ্রাবন্তী উঠে দাঁড়াল। এখন যেন অনেক হালকা লাগছে। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে শ্রাবন্তী মাসীমণির মুখের দিকে তাকাল। 'হ্যাঁ, তোমরা হেরে গেছ। যে নিজেকে শেষ করে দিতে পারে···তোমরা মিথ্যে অপবাদ দিয়েছে—ওরা ঠিকই বলেছিল সেদিন, সেই যে স্মৃতিরক্ষার কথা···মিথ্যে ভয় দেখায়নি। আমি জানি বাবা নেই! বাবা থাকলে আজ আসতোই···আসতোই···'

শ্রাবন্তীর আর তার বাবার কাছে কোন প্রশ্ন নেই।

# রিপোর্তাজ



"রাজনীতিকে অর্থনীতির আগে না রাখার মানে
মার্ক্সবাদের অ-আ-ক-খ ভুলে যাওয়া"—লেনি।

আলকাতরায় লেখা গোটা গোটা অক্ষর। অনেক রোদ জল সয়ে এখনো স্পষ্ট। আশ্চর্য, এ-দেওয়ালটা কেন পুলিশে চুনকাম করে দেয়নি? আশপাশের আর সব লেখাগুলোর ওপর তো বেশ পোঁচড়া টেনে দিয়েছে। আসলে ওরা বোধহয় বুঝতে পারেনি এটা কোন দলের শ্লোগান। মাও, চীন, কৃষিবিপ্লব প্রভৃতি স্ট্যাণ্ডার্ড কথাগুলোর অনুপস্থিতিতে চিন্তাই করতে পারেনি যে এটাও দেশদ্রোহীদের কম্মো। কিন্তু তা না হয় বোঝা গেল কিন্তু মার্ক্সবাদ কথাটাও কি চোখে পড়েনি? তা হতে পারে না। তবে কিনা একতলা আর দোতলার মাঝখানে একটা ওয়ালিঙে পৌঁছবার জন্য মেহনত তো কম করতে হয় না! মার্ক্সবাদ তো কত ধরনের হতে পারে! সিপিআইয়ের ধরনও তার মধ্যে একটা এবং এ ধরনের মার্ক্সবাদের কথা জাতীয় নেত্রীও বলেন। কাজেই সাত পাঁচ ভেবেই নিশ্চয় দেওয়াল সাফাই অভিযানের পুলিশ-কর্তা এটাকে বাদ দিয়েছিলেন।

কিন্তু বাদ দিয়েছিলেনই বা বলি কেমন করে? সেদিনের নামের শেষ 'ন'-টা তো দেখা যাচ্ছে মোছা রয়েছে। কেবল 'ন'-টা মুছেই ক্ষান্ত হল কেন? 'ন'-টা মোছার পরেই কি হঠাৎ মনে হ'ল এগুলো মোছার দরকার নেই? কিন্তু ততক্ষণে নিশ্চয় মই লাগানো হয়ে গেছল। মইয়ে একজন চড়েও ছিল। মইয়ে চড়েও সবটা না মুছে নেমে আসবে—না না, তা হতে পারে না।

তাহলে?

তাহলে ওরা নিশ্চয় এসে পড়েছিল। হ্যাঁ, ওরা। সমাজবিরোধীরা। যারা গেরস্তবাড়ির দেওয়ালগুলো কবিতা লেখার আদর্শ জায়গা ব'লে ঠাউরেছিল। কবিতা লেখা না স্লোগান লেখা! ওদের ধারণায় কি স্লোগানই কবিতা? অত্যাচারের প্রতিরোধে স্লোগানই নাকি কবিতা। থাকৃগে, স্লোগানই হোক বা কবিতাই হোক—এগুলো ওরাই লিখেছিল। এবং লিখেছিল রাত্তিরবেলায়, পাড়ার মোড়ে পাহারা রেখে, অত্যন্ত সাবধানে। কারণ বেআইনী কিছু লিখলে তার জন্যে শুধু কোর্টে যেতে হবে আর তারপর বিচার হবে—একথাটা ওরা আদৌ বিশ্বাস করতো না। হাতে নাতের শিক্ষা বলে কথা! বন্দুকের গুলি এসে বুকটা যখন ঝাঁঝরা করে দিতে পারে আর বন্দুক-চালক যখন দেশসেবার জন্য কয়েক শ' টাকার জাতীয় পুরস্কার পেতে পারে তখন না বিশ্বাস করাই স্বাভাবিক। তা এত পরিশ্রমের ফল, এত বিপদ মাথায় করে লেখা কবিতাগুলো পুলিশ এসে পুঁছে দেবে এটা যে ওরা সহজে মেনে নেবে না এ তো জানা কথা। কিন্তু ওদের মেনে নিতেই বা ক্ষতিটা কি ছিল? পুলিশকে বন্দুক নামিয়ে রেখে চুনকামের বুরুশ ধরিয়েছে এটাই কি কম কথা? গেরস্তদের চোখে তো পুলিশকে হেয় করা হ'ল! তাছাড়া লোকেও দেখল পুলিশ ওদের লেখাগুলোকেও কত ভয় করে! তবে কেন আবার বিপদের মুখে খামোখা এগিয়ে আসা? এর জবাব ওরাই দিতে পারে।

তবে কবিরা তাদের কাব্যকে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করে বটে! তাই হয়তো ওরা এগিয়ে এসেছিল। নিশ্চয় অতর্কিতে ওপাশের মোড় থেকে দু'জন ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। পরপর চারটে পেটো আছড়ে পড়ে ফেটেছিল। তারপর এদিকে রাইফেল বন্দুক আর ওদিকে হয়তো পাইপগান। খণ্ডযুদ্ধ। এবং সবই ক'টা শব্দকে মোছা বা রাখার জন্যে।

আচ্ছা ধরলাম খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল। সে সময়ের জন্যে মোছার কাজ অসম্পূর্ণ

থেকে গেছল। কিন্তু তারপরে কি আবার পুলিশ আসে নি? ফের লেখাগুলো মুছে দিয়ে যেতে আসেনি?

অবিশ্বাস্য!

তাহলে?

তাহলে—আর মাত্র একটা সম্ভাবনাই আছে।

ওরা রাত্তির বেলায় কবিতা লিখতে এসেছিল। পাড়ার দু'টো মোড়ে পাহারা রেখেছিল। সবচেয়ে যার হাতের লেখা ভাল সেই সুযোগ ও সম্মান পেয়েছিল মইয়ে চড়ার। তারপর নিঃশব্দে চোখ বুজিয়ে কালো ভাল্লুকটা চার চাকায় ভর করে হঠাৎ এসে পড়ল। ওরা গোটা চারেক বোমা নিশ্চয় চার্জ করেছিল। কিন্তু থামাতে পারে নি। মইয়ে চড়া ছেলেটা কি সুযোগ পেয়েছিল নেমে পালাবার? কিন্তু কবিতার মাত্র একটা শব্দ বাকী থাকতে কবিরা কি সেটা অসম্পূর্ণ রেখে সরে পড়তে পারে?

অসম্ভব।

তাহলে?

তাহলে পুলিশ ভ্যানটাকে ওরা যখন চার্জ করে তখন নিশ্চয় শুধু লেনিন—এই কথাটা লিখতে বাকী ছিল। আর পুলিশ ভ্যানটা যখন দু' দু'টো চোখ জ্বেলে মইটাকে, ছেলেটাকে আর কবিতাটাকে ফুটফুটে আলোয় ভরিয়ে দিয়েছিল তখন ও শেষ 'ন'-টা লিখতে যাচ্ছিল।

তারপর নিশ্চয় ছেলেটা গ্রেপ্তার?

উঁহু। কবিদের স্বভাবই এই যে কবিতা শেষ না করে তারা নড়তে চায় না।

তাই বন্দুক উঁচিয়ে উঠল।

তাই প্রচণ্ড গর্জন করে নেমে আসতে বলা হল।

তাই হঠাৎ দু'টো বন্দুকের নল তেতে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

নিশানার নিপুণতা আনার জন্য পুলিশ ক্যাম্পের মধ্যে বারবার অনুশীলনের মূল্য যে কতখানি বেশ বোঝা গেল। জাতীয় অস্ত্রাগারের স্টকলিষ্ট থেকে মাত্র দু'টো বুলেট কমলো। কাজেই সদ্য-সদ্য সোভিয়েত বা মার্কিন সরকারের কাছে এ-ঘাটতি পূরণের জন্যে নোট পাঠানোরও দরকার পড়ল না।

# বোধন



পেতলের হাতির পিঠে পেতলের মানুষ। হাতে পেতলের অঙ্কুশ। সময়ের সবজে ছোপ ধাতব অঙ্গে। ওই আবরণেই সুরক্ষিত বাহক ও আরোহী। উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনা সহজ। রসায়নের তরল ঝাঝে জারিয়ে বয়সটাকে মুছে নিলেই হয়। কিন্তু তার পর? অনাবৃত দেহের ওপর বাতাসের অদৃশ্য দুশমনরা আবার হামলা করবে। আরেক পরত পেতলকে সঙ্গমে জড়িয়ে নিয়ে কলঙ্ক রচনা করবে অম্লজান।

'না না, তার কোনো প্রয়োজন নেই।' পুতুলের দানাদার গায়ে স্নেহ ছোঁয়া বুলিয়ে যায়। মাস্টারমশাইয়ের আবাসে ওকে মসৃণ উজ্জ্বলতা হয়ে বিরাজ করার দাবি মেটাতে হবে না। বর্ষীয়ান প্রাচীন সেখানে সুরক্ষিত! ঐতিহাসিক সাহচর্যের অভাব ঘটবে না!

ঘড়ির কাঁটা নজরকে জানিয়ে দিল বাড়ি ছুঁয়ে যাবার অবকাশ নেই। এক দিনেই ফিরে আসতে পারবেন ভেবেছিলেন। দু-দিন ইশ্‌কুল কামাই হল। ঠোঁটের কোণে হাসি আসে। ঝোলা পোঁটলা সমেত মাস্টারমশাই ইশ্‌কুলের বারান্দার সিঁড়িতে পা রাখা মাত্র কৌতুহলের তরঙ্গ ছুটবে বার্তা নিয়ে। মাস্টারমশাইয়ের পাগলামির নয়া নজির। টিচার্স রুমে কৌতুক ও কৌতুহলের

যৌগিক প্রশ্নের মোকাবিলা করার জন্য আত্মরক্ষার ঢালটিকে এখন থেকেই গুছিয়ে রাখা ভালো।

'শেষ কালে তিনশো মাইল পথ ভেঙে এটিকে নিয়ে এলেন?'

'আমায় একবার বললেন না দাদা! আট গণ্ডা পয়সা বাস ভাড়া লাগত সাকুল্যে। গ্রামীণ হস্তশিল্প বিপণি থেকে কিনে আনতাম।'

মুখ খুলতে ওরা বাধ্য করাবে। ডোকরা শিল্পীর মোমের সুতোর পাকে পাকে মূর্তি রূপ নেবে আর মাস্টারমশাইয়ের উত্তেজনা বাড়বে। সন্তর্পণ আঙুলগুলো ঝোলা থেকে টেনে তুলবে বাবুইবাসা চুল্লিটা আর মাস্টারমশাই গর্বিত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবেন, 'অতই সোজা! পারবে এটা যোগাড় করতে? জানো, এটা কি?'

মোমের মূর্তি গড়া শেষ করবেন মাস্টারমশাই। তার পর মাটি-সুরকি-গোবরের তালে জলের পরিমাণের হিসেব মিলিয়ে সময়মতো মোমের মূর্তির চুল্লির গর্ভে প্রবেশ। কাঠকয়লার আগুন বুকে নিয়ে পেতলের ডেলা তখন প্রতীক্ষারত গর্ভদ্বারে। মোম গলবে, পুড়বে আর ধাতব তরলতা ঝরবে—টপ্ টপ্ টপ্…

মাস্টারমশাইয়ের সময় ফুরিয়ে যাবে এবার। শ্রোতারা কেউ ক্লাশ ফুরোনোর ঘন্টির তলব পাবে, কাউকে না-দেখা খাতাগুলো অকস্মাৎ হাতছানি দেবে, কয়েকজন খবরের কাগজের ক্ষুদ্রতম বিজ্ঞাপনটাকে চেটে দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়বে। শেষ সুযোগের অপব্যবহার আর অভদ্রতার দ্বন্দ্বে তারা শুধু চেয়েই থাকবে। সাময়িকভাবে দুরারোগ্য বধিরতার আক্রমণে মধ্যপন্থী অক্ষমতা। ইশ্‌কুল ছুটির বেলার জন্য মাস্টারমশাই অপেক্ষা করবেন। পড়ুয়ারা বারান্দায় তাঁকে ঘিরে ফেলবে। দু-দিনের বেহাজিরের রহস্য জমে পেটফোলা ঝোলাঝুলি দম নেবে হালকা হয়ে। তরল ধাতু এবার দুলকি চালে ঝরবে। পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া মোমের শূন্য স্থান পূর্ণ করবে। উত্তরের পাতা উলটে ফলাফল জেনে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণের গাণিতিক মজাটা নষ্ট করার ওপর ফৌজদারী নিষেধাজ্ঞা জারী হবে। একে একে বিভিন্ন দর্শনী যোগে ধাপে ধাপে সমস্যার সিঁড়ি ভাঙবেন মাস্টারমশাই। উত্তেজনা টলমল করবে। তার পর হইহই হততালির মধ্যে শেষ উত্তরটা আসবে পেতলের হাতির পিঠে চড়ে, পেতলের মাহুতের হাতের উদ্যত অঙ্কুশের ফলায়।

'মন গড়তে হবে মন। কৌতুহল। জিজ্ঞাসা। প্রশ্ন কর—প্রাণ ভরে

নির্ভয়ে প্রশ্ন কর। তবে না শিখতে পারবে। এই ত এতটুকু একটা পুতুল। না জানলে কেউ ভাবতে পারে, কত পরিশ্রম, কী কৌশল, কত পুরুষের দক্ষতা রয়েছে এটির পিছনে।'

সিঁড়িতে পা রাখলেন মাস্টারমশাই। অর্ধশতক পৃথিবী-গ্রহের বাসিন্দা হয়ে কাটিয়ে দিলেন তবু লজ্জা এখনো বিব্রত করছে দৃষ্টিকে। একটা সোরগোল অসীম ধৈর্যে দু-দিন ধরে মৌনব্রত পালন করছে। ক্লাশ এইটের ছুটি জ্যোতিষ্কের কক্ষপথ মাস্টারমশাইয়ের নিকটবর্তী হতেই তারা দিশাহারা হয়ে পড়ল। পরক্ষণেই চমকটা সামলে উলটো মুখে ছুট্।

ছেলেছুটো কিন্তু তাঁর আগমনবার্তা তারস্বরে নিক্ষেপ করে নি। সশরীরে বার্তা হয়ে ছুটে গেছে নিঃশব্দে। স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমটা মাস্টার মশাইয়ের খেয়ালে পড়েনি। বারান্দায় হাজির হতেই অপ্রাকৃতের একটা চড়া গন্ধ তাঁকে সজাগ করল। ছেলের দল দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীরবে তাঁর আগমনকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। অহেতুক দূরত্ব ও নৈঃশব্দ্যের বিস্ময়ে মাস্টারমশাইয়ের গতি রুদ্ধ। ধরাধামে কোনো পরিচিত ছাত্র তাঁর সঙ্গে সভয় দূরত্ব বজায় রাখতে পারে এই উপলব্ধি তাঁর উনত্রিশ বছরের শিক্ষকজীবনে জ্ঞানত ইতিপূর্বে ঘটেনি।

চিন্তা নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় পেলেন না মাস্টারমশাই। গোটা টিচার্স রুমটা এখন তাঁর সামনে পাঁচিল বসিয়েছে।

একটা অসম্ভবের সামনে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাই কার্যক্রম খোঁজার চেষ্টা করেন, 'ব্যাপারখানা কি? সার্কাসের বাঘ দেখছে নাকি সবাই?'

নিজেরই প্রশ্ন আর হাসি জুড়ে চলনপথটা গড়ে নিতে চান।

আবার আরেক ঝলক নিরুত্তর অবস্থান ধৈর্যচ্যুতি ঘটায়, 'হলটা কি! কিছুই ত বুঝতে পারছি না।'

বোবা আবহাওয়ায় অবশেষে স্পন্দন জাগে। হেডমাস্টারমশাইয়ের পায়ে লম্বা লম্বা ভয় এগিয়ে আসে।

'মাস্টারমশাই, একবার আমার ঘরে চলুন।'

গলার এই স্বরে, অবনত দৃষ্টিতে অমঙ্গল যেন কেঁদো কেঁদো পুরনো ভাঙা ছাপার হরফের ধ্যাবড়া কালির ছোপ। গুরুত্ব ধরা পড়ে, অর্থভেদ করা যায় না।

মাস্টারমশাইকে কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে তিনি পিছন ফিরে

পতিসঙ্কল্প করলেন। ঘরে ঢোকার আগে মাস্টারমশাই দ্রুত পা চালিয়েও তাঁকে প্রশ্নের নাগালে পেলেন না।

'বসুন মাস্টারমশাই।'

ঘরের পরদাটা আরেকটু টেনে দেওয়া। পাখাটা ছেড়ে দেওয়া। অর্থাৎ কিছু কালক্ষেপ। প্রস্তুতিপর্ব দীর্ঘায়িত হয় আর আবহাওয়ায় থকথক করে ঘন গুমোট। 'মাস্টারমশাই…তালতলা থানা থেকে… পুলিশ এসে ছিল… একটু আগে…'

'বুবাই!'

সযত্নে রচিত ভঙ্গুর ও জ্যোতির্ময় একটি শব্দ। মনের নিয়ত পাহারা এড়িয়ে আছড়ে পড়ল পাথুরে জমিতে। আর্ত-ঝঙ্কার আর খান্‌খান্‌ অন্ধকার।

প্রথম আর্তনাদেই সব জিজ্ঞাসা মিটিয়ে নিঃসম্বল দৃষ্টি হয়ে বসে রইলেন মাস্টারমশাই। সাতের দশকের পিতৃত্বের প্রতিনিধি।

বুবাই ধরা পড়েছে সন্দেহাতীত। কিন্তু কতখানি ধরা পড়েছে? প্রশ্নটি বড় নির্লজ্জ। হেডমাস্টারের আচরণের তুলাদণ্ডেই তাঁকে খুঁজে নিতে হবে বিপদের নির্ভেজাল ওজন।

'মাস্টারমশাই, আপনার এখুনি একবার থানায় যাওয়া দরকার।'

'উমা?'

'বৌদি থানাতেই আছে। কিন্তু আপনি সই না করলে বোধ হয়…'

সই না করলে ছেড়ে দেবে না বুবাইকে। এতখানি গুরুত্বপূর্ণ তাঁর সই, স্বাক্ষর…

বুবাইয়ের স্বাক্ষর সংগ্রহের ছোট্ট ডায়েরিটা নিশ্চয় উমার যত্নে নিরাপদ আছে। ক্লাশ থ্রিয়েতেই মহামানবদের নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

'…সই যোগাড় করে কি হবে রে বুবাই?'—'কেন? কত বড় বড় লোক, আমার খাতায় নিজে হাতে নাম লিখে দেবে।'—'কোন লোকটা বড়, কোনটা ছোট, বুঝবি কি করে?'—'বারে! নাম-করা লোকেদের ত সবাই চেনে।'—'গুণ্ডামিতেও ত লোকে নাম করে। তা হলে তারও সই নিবি?'—'তা কেন, ভালো ভালো নামকরা লোকেদের নেব।'—'তাহলে ত আবার কে ভালো লোক জানা দরকার। কি কি ভালো কাজ করেছে।'—'এত কথা জানি না যাও। আমায় অনেকগুলো নামকরা লোকের সই যোগাড় করে দিতেই হবে!'…

…'না না, আমি চাই না খাতা। বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি করে দিয়েছ!' স্মৃতির চলচ্চিত্রে বুবাই চিৎকার করে সইয়ের খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে ছুটে গেল মায়ের কাছে। বাবা তার অমন ঝকমকে খাতাটায় কতগুলো মোটা মোটা আঙুলের কেলে কেলে ছোপ লাগিয়ে দিয়েছে।

'পারো বাবা তুমি! নিজে যেমন, ছেলেকেও এখন থেকেই সেইরকম দেখতে চাও।' মায়ের প্রশ্রয়ে বুবাইয়ের কান্না আরো উৎসাহ পায়।

'এই ছাখো, কিছু জিজ্ঞেস করল না, বুঝল না, অমনি কাঁদতে শুরু করে দিল। বুবাই, তুমি জান ওগুলো কাদের হাতের টিপসই? ওদের বংশের লোকই বহু যুগ আগে ভারতে প্রথম লোহার জিনিস বানিয়েছিল। বিখ্যাত আবিষ্কারক। কয়েক বছর পরে হয়ত এদের একজনকেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন বুবাইয়ের খাতার এই টিপসইয়ের কত দাম হবে বল ত?'

বুবাই তবু নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারে নি। যারা লিখতে অবধি জানে না, কেমনতর নামকরা লোক তারা।

এবার বুবাইকে বোঝাবার পালা। নানা অদ্ভুত হিজিবিজি সাজসরঞ্জাম বেরিয়ে পড়ে। সাপুড়ের ঝাঁপি, বেদের ঝুলিও হার মানে। লোহামাটির তাল, সুতো বাঁধা চামড়া ঢাকা গোলাকার বাক্স যার নাম হাপর। হাপরের দেহে লম্বা বাঁশের মুখ। বাবা মাটি খোঁড়ে, চুল্লি বানায়, কাঠকয়লা ঠেসে আগুন জ্বালে, হাপরের হাওয়ায় চনমন করে আগুন। লোহামাটি গলে লোহা বেরয়…বুবাই হাঁ করে শোনে বাবার কথা, লোহারুদের কীর্তি। সইয়ের কথা বিস্মরণ…

সই! আজ মাস্টারমশায়ের সই করার কথা। মাস্টারমশাই বর্তমানে নামকরা লোক। বাবা হলে যে কেউ এখন যে-কোনো মুহূর্তে নাম কিনতে পারে। মাস্টারমশাইয়ের মতো বুবাইকে ফেরত আনার সময় সই করবার জন্য ডাক পড়বে। কিন্তু বুবাইকে কতটা ফেরত দেবে ওরা?

প্রশ্নটাকে না গড়েই রেখে দিলেন মাস্টারমশাই। সারাটা জীবন তিনি ছাত্রদের প্রশ্ন করতে শিখিয়েছেন। নির্বোধ অহেতুক কৌতূহলের বশে প্রশ্নের জাত খোয়াতে পারবেন না।

অযাচিতভাবে বুবাইকে পুরোপুরি ফেরত পেলেন মাস্টারমশাই। ইতিহাসের মরা চামড়ায় অস্ত্রোপচার করে পরিচয় আবিষ্কার করলেন তিনি। নিজের পুত্রকে

সনাক্ত করার প্রমাণ দাখিল করলেন অনায়াসে। ডান দিকের কণ্ঠার ওপর একটি নিটোল কালো গোল তিল। তারপর সেই মর্মে বিবৃতির নীচে দস্তখত।

থানার বারান্দায় শুয়ে ছিল বুবাই। মা ওর হাত ধরে বসে। অবাধ্য বুবাইকে ওরা ফিরিয়ে এনেছে। অনেকদিন পরে এল বুবাই। আর ও কোনদিন যাবে না।

পুলিশ সেক্‌শন্ হড্‌সের গেটের বাইরে ছেলেদের কয়েকটা গলা চাবুক হাঁকড়ে মাস্টারমশাইকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল।

'চলে যা! চলে যা এখান থেকে! বাহাদুরি দেখানো হচ্ছে, না? ইস্কুল ছেড়ে চলে আসা, সাহস ত কম নয়!'

বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করে ছাত্রদের অনভিপ্রেত জমায়েত।

হেডমাস্টারের নীরব অবস্থান তাঁর পিছনে। একটা চেনা মানুষের অচেনা রূপের সামনে ছাত্রেরা দৃষ্টি নত করে। নিঃশব্দে আদেশ মেনে সম্মান দেয় তারা আর অনিচ্ছা ব্যক্ত করে মন্থরতায়।

মাস্টারমশাই বুবাইয়ের মায়ের পাশে এসে দাঁড়ালেন। পিছনে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার। কর্তব্যপালনের দায়িত্বভারজনিত কিঞ্চিত অস্থিরতা জুড়োতে হেডমাস্টারের সঙ্গে সংলাপ স্থাপন করেছেন।

'ভেবে দেখুন ত! এই তাজা তাজা ছেলেগুলো! ছি ছি ছি—শুধু কয়েকটা লোকের উসকানিতে। রাজনৈতিক নেতা। আমরা সত্যিই নিরুপায়। অভিভাবকরা যদি শক্ত হাতে শাসন না করে, কি যে দাঁড়াবে দেশের হাল···'

হেডমাস্টার কথোপকথনের কেন্দ্রকে সরিয়ে আনেন মাস্টারমশাইয়ের শ্রুতিসীমার বাইরে। ভারপ্রাপ্ত প্রশাসনের বক্তব্যে তাঁদেরই গতকালের কণ্ঠের রেশ। বুবাইয়ের মায়ের গলাও সেখানে মিশে আছে। কিন্তু তখন নিরুদ্দেশ ছিল বুবাই আর আজ তার মোক্ষম ঠিকানা নির্দিষ্ট।

'উমা, তুমি কি আমার হাতে রক্তের দাগ দেখছ? উমা!'

মাস্টারমশাই নিস্পন্দ। না, বুবাইকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন বলার অর্থ বুবাইকেই ছোট করা। আসলে বুবাইয়ের কাছে তিনি পরাজিত। বুবাইকে তিনি প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিলেন এবং বুবাই প্রশ্ন না করে চলে যায় নি। মাস্টারমশাই নিজেই পারেন নি উত্তর দিতে। উত্তর তাঁর জানা ছিল না। সাবালক বুবাই স্বয়ং প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে নিতে চেয়েছিল। বুবাইয়ের মৃত্যুও তাই সাবালক। 'না বুবাই, প্রশ্ন করে তুমি ভুল কর নি। কোন ভুল কর

নি। কিন্তু উত্তরটা পেয়েছিলে কি? না পেলেও গোপন কোনো রত্নভাণ্ডারের পথের হদিস নিশ্চয় পেয়েছিল বুবাই ওই প্রশ্নেরই হাত ধরে। না হলে…'

'কখন গাড়ি আসবে তার কি ঠিক আছে! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, চলুন ঘরে গিয়ে বসি।' বুবাই তবু উদ্দিপরা শাসনব্যবস্থাকে নাকাল করছে। তার বাবার সঙ্গে একটা সংযোগের সেতু তাই ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার আকুতি।

'একটা ফোন কলের চার্জ এখন কত পড়ে?' মাস্টারমশাই মুখ তুললেন।

'ফোন্…আট আনা…কেন?' সূত্রহীন প্রশ্নের ধাঁধায় উত্তরটা ছিন্নভিন্ন।

পকেট থেকে খুচরো পয়সা তুলে সমষ্টি পঞ্চাশ করে তিনি এগিয়ে ধরেন।

একটি প্রাণবন্ত আপত্তির অনিচ্ছাকৃত ভ্রূণহত্যা ঘটালেন পুলিশ অফিসার এবং সংযমকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত করলেন।

বুকের মধ্যে তিনটে বুলেট মিইয়ে গেলে সরকারি ক্ষতি পূরণ করতে কার্পণ্য করেন নি বুবাই। বুবাইয়ের বাবা ব্যক্তিগত কারণে হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি ডেকে আট আনা পয়সার জন্যে ঋণী থাকতে পারেন না। যুক্তি অতি সরল সুবিদিত সর্বজনগ্রাহ্য। ঘরে বসতে বলার নিরীহ আহ্বানের মধ্যে ঔদ্ধত্যের চরমসীমা নির্দেশ করেছেন মাস্টারমশাই অবলীলায়।

পরবর্তী অধ্যায়ের তিনঘণ্টাব্যাপী পারলৌকিক ক্রিয়াদি মাস্টারমশাইয়ের নির্বিকার ঔদাসীন্যের প্রলেপে নিস্তাপ নির্বীর্য ও শোকোৎপাদনে অক্ষম প্রমাণিত হল। বুবাইয়ের সঙ্গে এক দীর্ঘ যুক্তিতর্কে তিনি জড়িত ছিলেন। অবশেষে বুবাই তাঁকে বোঝাতে পেরেছে, বুবাইয়ের ব্যাখ্যা তাঁকে তৃপ্ত করেছে। নিরুদ্বেগে বুবাইয়ের শব্দ বাক্য উক্তির হাত ধরে এগিয়ে চলেছে মাস্টারমশাইয়ের চিন্তা।

…বাবা, তুমি নর্মান বেথুনের জীবনী পড়েছ? কালই শেষ করেছি। বইটা যদি পড়াতে পারি, আমার কথা তোমাকে মানতেই হবে তখন। জানো, আমাদের এখানে ভারি সুন্দর একটা গান গায় সবাই—

জন্মিলে মরিতে হবে জানে তো সবাই
তবু মরণে মরণে অনেক ফারাক আছে ভাই
সব মরণ নয় সমান।

বেথুনের মৃত্যু হিমালয়ের চেয়ে ভারি। সামনের মাসে বাড়ি গিয়ে গানটা তোমাদের শোনাব। সুর ছাড়া বাণীর অর্ধেকই হারিয়ে যায়···

হাঁসের পালক আর হিমালয়, মৃত্যুর দুই শ্রেণী বিশেষণ। কাল বেথুনের মধ্যে হিমালয় আজ বুবাইয়ের মধ্যে হিমালয়। এক নিরবচ্ছিন্ন বিশালতা, অনুভূতি যার নাগাল পায় না। শোকে দ্রবীভূত ক্রোধ, ক্রোধে ঘৃণা। শোক-ক্রোধঘৃণার দ্রবণে উপাদানগুলি স্বতন্ত্র করা এক সমাধানহীন সমস্যা।

অন্ধকার বাড়িটার সামনে পা দুটো শিথিল হয়ে এল। মনটা সময় চেয়েছে। উমা এবং অন্ধকারের মুখোমুখি হবার আয়োজন। বুবাইও ঠিক এমনি ভয় পেত মাকে। বার্ষিক অঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার অনুভূতি। যতই প্রস্তুতি নাও উৎকণ্ঠা ঘুচবে না। বুবাইয়ের গা ছমছম করত, বুকটা হিম মেরে আসত। মা এক ডেলা আবেগ আর আদর। সেই অখণ্ড আকুলতার সামনে যুক্তি হারিয়ে যায়, প্রশ্নগুলো বেকুফ আর সবলতা কসরৎ মাত্র। মা মানেই অবুঝ আকাশ। সেই অসীম ব্যাপ্তির একমাত্র দাবি তার বুবাই শুধু ঝলমল করুক অনির্বাণ নির্মল আনন্দে। দুর্বল বোধ করত বুবাই মায়ের সান্নিধ্যে। আশঙ্কা হত স্নেহের রামধনু বুঝি দিকবিভ্রম ঘটায়।

··মা-কে আমি বুঝতে পারি না বাবা। তোমার সঙ্গে তর্ক করি, কিন্তু তোমাকে বুঝতে পারি। সত্যি বলতে বাড়ি থেকে চলে আসার পর আমি যেন তোমার আরো কাছে আসতে পেরেছি। অনেক বেশি চিনতে পেরেছি। তুমি আমাকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিলে। বিনা প্রশ্নে আজ অবধি আমি কিছু মেনে নিই নি, নেবও না। কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানো, একটা প্রশ্নের জবাব বোধ হয় কোনোদিনই আমি পাব না। মা। রোজ সকালে উঠেই মায়ের কথা মনে পড়ে। ইচ্ছে হয় ছুটে চলে আসি। অথচ আমি জানি মা-র কাছে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায় সব কিছুর চেয়ে বড় আমি। হয়ত বা পাপপুণ্য এমন কি ওই কুলুঙ্গির কেষ্টঠাকুরটির চেয়েও বড় আমার নিরাপত্তা। আমি ওয়াগন-ব্রেকার হয়ে পালালেও মা এমনি ছটফট করত। এটা আমি মেনে নিতে পারি না, আবার মা-কে আঘাত করতে হয় বলে নিজেও কষ্ট পাই। অদ্ভুত! চিঠিটা মা-কে দেখিও না কিন্তু। কাঁদবে। চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলতে ভুলো না। একটা চিঠি লিখে রেখো সময়মতো। ঠিক কেউ গিয়ে নিয়ে আসবে···

ঠেসানো দরজাটা অন্যদিনের সঙ্গে বর্তমানকে মিশে যেতে দেয়নি। ডেকে ভেতরে ঢুকতে হয়নি। বন্ধ দরজার পিছনে উমার অতন্দ্র উৎকণ্ঠার চাকরি খারিজ হয়ে গেছে। সর্বস্ব লুঠ হবার পর প্রহরীতে কি প্রয়োজন!

থানা থেকেই সরাসরি বাড়ি চলে এসেছে উমা। একরকম জোর করেই হেডমাস্টারের সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। একা একা বসে থাকা এতক্ষণ। বুবাইকে কিন্তু হিংসুকের মতো একা ভোগ করতে ভালোবাসত উমা।

ওপরতলার ওরা কেউ আসে নি। তাহলে কণ্ঠস্বর ভাসত। উমা বাহন না হলেও সংবাদটা পৌঁছয় নি মনে করা শক্ত। বুবাই বাড়ি ছাড়ার পর থেকে এই পরিবারটিকে সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত জ্ঞানে তেরছা দৃষ্টির আড়ালে পাড়াটা আত্মগোপন করছে। বুবাইয়ের প্রত্যাবর্তন আচরণবিধির হেরফের ঘটায়নি।

'কে?' উমা মাস্টারমশাইয়ের পায়ের শব্দ পায় নি তবু চমকে উঠে দাঁড়াল না। উৎকণ্ঠা অভিযোগ কোনোটাই আপ্যায়ন জানাল না। উমা এখন একটা বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। নিয়মমাফিক হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন আছে, ফুসফুস ক্রিয়াশীল, দেহের কোষে কোষে প্রাণের এককরা কর্তব্যরত। জীবনের সংজ্ঞা অনুসারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে জীবিত।

'একটু দেরি করে ফেলেছি।' বিনা প্রয়োজনে কৈফিয়ত দেবার অভ্যাসটাও একটা অবলম্বন। শব্দের শিকড় গেড়ে মাটি কামড়ে ধরা। 'সতীর বাবা এসেছিলেন খবর পেয়ে। সতীকে মনে পড়ছে?'

…সতীদিকে চেন ত তুমি বাবা? সতীদি ধরা পড়েছেন। হিংস্রজন্তুরা আর মুখোশ রাখতে পারছে না। আমরা ওদের পেটে পা রেখেছি। লালবাজারে আধুনিক পদ্ধতিতে সতীদিকে জেরা করেছে। আমাদের নাম ঠিকানা আদায় করতে না পেরে একটা জলন্ত সিগারের ছেঁকায় সতীদির গলায় বুকে রক্তমাংসচামড়া পোড়া উল্কি এঁকেছে। এর পরেও তুমি বলবে বাবা, আমরা ভুল করছি?…

'শুনলাম সতী এখন ভালো আছে। জেল হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। লালবাজারের সেই আই. বি. অফিসারের নামটাও নাকি জানা গেছে। ওঁরা মামলা দায়ের করার চিন্তা করছেন।'

বুবাইয়ের মায়ের দৃষ্টি অনুসরণ করতে গিয়ে মাস্টারমশাইয়ের কণ্ঠ স্তিমিত হয়ে আসে।

মুখ ফিরিয়ে খাটের প্রান্তে বসে আছে উমা। মুখে যাই বলুক বুবাই, তার মায়ের মনটাকে সে জহুরীর মতো চিনত। নির্ভয়ে আঁচড় কাটত তাই। ভীতির জ্বালা ধরিয়ে মাকে কাঁদাত।

…মা যদি না কাঁদে ত মরে যাবে। সত্যি মরে যাবে। এত ভয় ভাবনা বুকের মধ্যে পুষে কেউ বাঁচতে পারে। বলো বাবা, তুমি পারতে ?…

মাস্টারমশাইয়ের নিজস্ব জগতে তিনি মুক্ত অবাধ। বুবাইয়ের সামনে পুব গগনের অমল জ্যোতি। কিন্তু উমার পৃথিবীটা ভয়ভাবনার কালো ইটে গড়া। সেই সংকীর্ণ রাজ্যের বাসিন্দা বলতে দু-জন। স্বামী ও সন্তান। উমা সেখানে প্রহরী হতে চেয়েও নিরুপায় দর্শক। বহুদূরে বসে ভালোবাসার আগুন জ্বেলে হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছে দুই অন্ধ বধির নির্বোধকে।

'কি দেখছ উমা ?' সস্নেহ জিজ্ঞাসা ধরে উমার একাগ্র দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলেন মাস্টারমশাই। মুহূর্তের অবসরে ইচ্ছাপূরণের খবর ছিল অস্ফুট পুনরুক্তি, 'না ! না !' দুটি প্লুত অনিচ্ছা বা অবিশ্বাস।

বুবাইকে মাথায় বালিশ দিয়ে শুইয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে উমা। হাফপ্যান্টটা কাদামাখা। গেঞ্জিতে তিনটে সুতো পোড়া গর্ত। বাসী রক্তে ছাপানো খেলোয়াড়ের ঘেমো হলদে গেঞ্জি।

গেঞ্জি ও নিদর্শন। বুবাই ও ইতিহাস। মৃত্যু ও স্মরণীয়। ঐতিহাসিক নিদর্শন। স্মরণীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন। বরোবদুর, কোনারক, অজন্তা এবং সংরক্ষণের সমস্যা। উদার প্রকৃতির নিষ্পাপ বালখিল্য নির্মমতা। আলোর বন্যায় সোনা ঝরে, হাওয়ার চামরে আরতি আর সমুদ্রের দর্পণে প্রসাধনী। প্রকৃতিতে অবগাহন করে সৃষ্টি পায় সৌন্দর্য আর সৌন্দর্য পায় নশ্বরতা। সৌন্দর্য আর নশ্বরতার দ্বন্দ্বে ঐতিহাসিকের রক্ষণশীল অবস্থান। প্রকৃতি থেকে ছিন্ন করা চাই সৌন্দর্যের নির্বাচিত সন্তান। রুদ্ধ করতেই হবে কালস্রোত। সৌন্দর্য ও আবেগের উৎসে বাঁধ বেঁধে প্রাণ হবে নিষ্প্রাণ একটি সত্তা এবং মৃত্যুঞ্জয়।

'ছুঁও না, ছুঁও না উমা !' অবিশ্বাস্যের ঝড়ো আক্রমণ কাটিয়ে সংগ্রহকারী নিজস্ব সত্তা খুঁজে পেয়েছেন। ধমকে ওঠেন তিনি, 'একদম হাত দেবে না। আর কি কি ছিল দেখি পুঁটলির মধ্যে।' মাস্টারমশাইয়ের কানে ইতিহাসের মধুর পরিচিত সম্ভাষণ।

থানা থেকে ফেরত দিয়েছে বুবাইয়ের শেষযাত্রার পাথেয়টুকুও। অশোকস্তম্ভ-শোভিত কয়েকটি রাজমুদ্রা।

সংগ্রাহকের চরণে লুটিয়ে পড়ে ইতিহাসের মিনতি। আশ্রয় খোঁজে। রক্ষা করো। চিত্র কি মূর্তি, নিষিদ্ধ স্পর্শের অতি সম্ভোগে ইতিহাসের কত গরবিনীর উদ্দাম কটাক্ষের ইন্দ্রজালও আজ বিধুর। ভালোবাসার ব্যভিচারী বৃত্তি নিবারণ করুক সংগ্রহকারীর পেশাদারী অভিজ্ঞান। পয়সাগুলোকে অ্যান্টি-অক্সাইড কোটিং দিয়ে নিলে সবচেয়ে ভালো। এখনকার মতো প্লাস্টিকের কৌটোয় রাখা যেতে পারে। শাদা সিলিকা জেল্ থাকবে তারই মধ্যে থলিতে ভরা। অবাঞ্ছিত জলীয় বাষ্পকে শুষে নীল হয়ে ওঠবার অপেক্ষায়। কৌটোর মুখের সীল্‌টায় হাওয়ারা মাথা কুটবে প্রবেশাধিকার না পেয়ে। কিন্তু গেঞ্জিটা? ঘাম? রক্তের দাগ? কাগজের পরিবর্তে এখন কাপড়, রঙের পরিবর্তে রক্ত। চিত্রসংরক্ষণ পদ্ধতি এখানে কতটা প্রযোজ্য? রক্ত একটা জৈব বস্তু। বিন্দু বিন্দু অসংখ্য প্রাণের রূপ ও রঙ কতখানি রক্ষা করা যাবে অবিকৃত? তীব্র শীতলতা রক্তকে জিইয়ে রাখে। তুষারমেরুর গভীরে আবিষ্কৃত প্রাগৈতিহাসিক জীবনের কলঙ্কহীন দেহ। কোনো স্পর্শ নয়, জৈব কি অজৈব, মানুষ বা আবহাওয়া।

'উমা, ভেতরের ঘরের চাবিটা একবার দেবে? এগুলো···' উমার হাত চাবিটা বাড়িয়ে দিল না। স্বয়ং উঠে এল। নিজে হাতে চাবি খুলে, দরজা ঠেলল। আলো জ্বেলে দিল যক্ষপুরীর। ইতিহাসের শবদেহের বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঙ্গ মাস্টারমশাইয়ের কঠিন রাসায়নিক প্রযত্নে জরা জয় করেছে। সারাটা ঘর জুড়ে চিরস্থায়ী মৃত্যুর থইথই।

'না না বুবাইকে তুমি এখানে রেখো না। আমি কিছুতেই রাখতে দেব না!' শব্দগুচ্ছ মাস্টারমশাইয়ের পায়ে এসে লুটোয়। বুবাইয়ের মা বুবাইয়ের দ্বিতীয় মৃত্যুদণ্ড মকুব করার জন্য বিচারকের দরবারে বিনত। 'আমি সব মেনে নিয়েছি, তুমি যা করেছ, যা চেয়েছ—সব। আমি পারছি না, আর সহ্য করতে পারছি না '

উমার সব রচনাই মাতৃত্বের পবিত্র শোকগাথা। শোক কিন্তু দিনে দিনে সময়ের ঘর্ষণে ছিঁড়ে যায়। স্মৃতি মলিন হয়। আর আবেগহারা শোক-গাথার আধারে কোনো সত্য নিরাপদ নয়। সন্তানের চেয়ে বেশি দাবি নিয়ে এসেছে বুবাই। সম্পর্কের পরিচয় তার পক্ষে অপ্রতুল।

'উমা! চুপ করো! বোকার মতো কথা বলো না। ওঠো। উঠে দাঁড়াও!' পূর্ণ আত্মপ্রত্যয় উচ্চারণের প্রতিটি স্বরক্ষেপে অবশ করে দেয় আবেগের নিরর্থক উৎস।

দু হাতে উমার কাঁধ চেপে ধরেন মাস্টারমশাই। জলন্ত চোখদুটো ভয়ংকর ভাবে অগ্রসর হয়। বুবাই নয়, এখানে ইতিহাসের জল্লাদরা বাস করবে। প্রাণ নয় প্রাণের শত্রু—তারই নিদর্শন প্রমাণ স্বাক্ষর। অনর্গল কথা ঝরে, এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব চেয়ে গোপন কথা, সংগ্রহকারীর প্রতিজ্ঞা। বুবাইয়ের হত্যাকারীকে ইতিহাসে বন্দী করার জন্য বুবাইয়ের মৃত্যুকেও চিরস্থায়ী করতে যে কুণ্ঠিত নয়। বুবাইয়ের মা-র চোখের সামনে দ্বিতীয় বার খুন হয়ে গেল বুবাই। প্রাণ মন পরিচয় সমেত ইতিহাসে নিখোঁজ হয়ে গেল ব্যক্তি, তৈরি হল প্রতীক।

'আমি সব বেচে দেব। সব। সারা জীবন ধরে সঞ্চয় করেছি। কিছু দাম ত পাব। এখন আমার টাকা চাই। বুঝলে, অনেক টাকা।'

বুবাইয়ের ভালোলাগা রক্ষা করতে শোকের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে উমার বিস্ময়। ম্লান প্রতিবাদ করে, 'বেচে দেবে! কেন? আমি কদর বুঝি না বলে…বুবাই যে লিখেছিল…'

…বাবা, হঠাৎ সেদিন একটা বইয়ে দেখলাম লু শুন বিপ্লবের তাণ্ডবের মধ্যে বসেও চীনের লুপ্তপ্রায় হস্তশিল্পের নিদর্শন সংগ্রহ করতেন। লেখাটা পড়েই লাফিয়ে উঠেছিলাম। এই ত আমার বাবা। বাবা, তুমি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করেও আমাদেরই কাজ করছ। এইজন্যেই ত তোমায় এত ভালোবাসি…

'সংগ্রহের কাজ ত আর বন্ধ হচ্ছে না। এইগুলোকে খালি বেচে দেব। সেই টাকায় এবার আমি সংগ্রহ করব অমূল্য সম্পদ। তার কাছে এ সবই তুচ্ছ।' সংগ্রাহকের ঐতিহাসিক দৃষ্টি বর্তমান পেরিয়ে ছুটে চলেছে। ভবিষ্যতে দাঁড়িয়ে তিনি বুবাইয়ে, বুবাইয়ের মৃত্যুতে এক গৌরবময় পুরাকীর্তি প্রত্যক্ষ করছেন।

বুবাইয়ের মা-কে একমাত্র শ্রোতা করে সারারাত রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করল একটা উন্মত্ততা। ইতালীর জাতীয় সংগ্রহালয়ের ইলেকট্রনিক চোখকে

ফাঁকি দিয়ে চুরি হয়। পিরামিডের দুর্গম অন্তঃপুর থেকে সহস্র বর্ষের অন্ধকার ভেদ করে পথ চিনে উধাও হয়ে যায় মমি। সংগ্রহকারীর অসাধ্য কিছু নেই। ছেঁদো নীতিবোধ সংগ্রহকারীর গুণাবলীর তালিকাভুক্ত নয়।

মাস্টারমশাইয়ের লোভনীয় খতিয়ান: বুবাইয়ের শেষ পরিধেয়। সংগৃহীত। বুবাইয়ের শেষযাত্রার পাথেয়। সংগৃহীত। একটা লাইটার সতীর বুকে ছেঁকা-দেওয়া সিগারটাকে জ্বালিয়েছিল। সংগ্রহযোগ্য। একটা রাইফেল বুবাইয়ের বুকের গর্তে সীসে ঢেলেছে। সংগ্রহযোগ্য।

তুলনামূলকভাবে সংগ্রহকারীর কাছে সবই অতি সহজ শিকার। টাকা চাললে বাঘের দুধ মেলে এ দেশে। বন্দুকের মাছি এখানে বুবাইয়ের হৃৎপিণ্ডটা নির্ভুল খুঁজে বার করার চাকরি করে। খুঁজে পেলে বুবাইয়ের প্রাণ মরে, খুঁজে না পেলে চাকুরিদাতার কোপে চাকুরি যায়, অন্ন ঘোচে, মাছিওলা মানুষটার পেটে বোমা ফাটে। অতএব অর্থ ও নিদর্শন সংগ্রহের সমীকরণটি নিটোল।

বুবাইয়ের রক্তের স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করেছে ইতিহাসের একটি প্রাঙ্গণে। তারই শিখায় উদ্ভাসিত সংগ্রাহকের পেশাদারী উল্লাস নিহত করেছে পুত্রশোক। বুবাইয়ের চেয়ে মূল্যবান তার শেষ দুটি দান অবলম্বন করে সংগ্রহের ধারাপথ এখন ইতিহাসের অবহেলিত প্রান্তর অধিকার করার জন্য লুব্ধ উৎসুক।

বিচারক রাজীব মণ্ডলকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে তার শেষ ইচ্ছা জানতে চাইলেন। রাজীব মণ্ডল কাঠের বেড়ার মাথায় দু' কনুই রেখে সাগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়ল। চোখ দুটো তার জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

—হুজুর, আমার একটা প্রশ্ন আছে। এই প্রশ্নের একটা উত্তর পেলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।

—বলো, কী তোমার প্রশ্ন। কাকে প্রশ্ন করতে চাও। নিশ্চয় উত্তর পাবে।

—প্রশ্নটা আপনার কাছেই হুজুর। ভগবান আমার প্রাণ দিয়েছিলেন, সেই প্রাণ আপনি কেড়ে নিচ্ছেন। হুজুর সাক্ষাৎ ঈশ্বরের চেয়েও শক্তিমান। আমার প্রশ্নের জবাব আপনিই শুধু দিতে পারেন।

—ঠিক আছে, বলো কি তোমার প্রশ্ন।

—আমার এরকম হল কেন হুজুর?

—কিসের কি হল? খুলে বলো প্রশ্নটা।

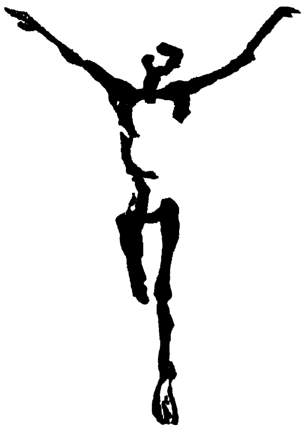
—আমায় মরতে হল কেন?

—তুমি অন্যায় করেছ। জঘন্যতম অন্যায়।

—কেন আমি অন্যায় করলাম হুজুর?

—তুমি অত্যন্ত লোভী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তাই লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যায় করেছ।

—কেন আমি এত লোভী হলাম হুজুর?



দণ্ড-বিচার

—কেন লোভী হলে কেউ বলতে পারে না কিন্তু কাজটা যে লোভীর মতো করেছ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—এত লোক থাকতে হুজুর একা আমি কেন লোভীর মতো কাজ করলাম?

—তোমার আত্মসংযম কম। লোভ সব মানুষেরই কম-বেশী আছে কিন্তু তারা সেটা নিয়ন্ত্রণে রাখে, চেপে রাখে।

—আমি কেন আর পাঁচজনের মতো লোভ চেপে রাখতে পারলাম না হুজুর?

—ওই যে বললাম, তুমি আত্মসংযমী নও।

—আত্মসংযমী কাকে বলে হুজুর?

—যে ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা ক'রে চলে। অন্যায় মনে হলে হাজার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে-কাজ করে না।

—কিন্তু সে-কাজটা যদি আরেকজনের অন্যায় বলে মনে না হয়?

—ন্যায় যা তা ন্যায়, অন্যায় যা তা অন্যায়।

—কোন্‌টা ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায়, কোত্থেকে জানা যায় হুজুর?

—আইনের বইয়ে লেখা আছে।

—বই! আমি যে পড়তে জানি না হুজুর। সে কেতাব কোনদিন চোখেই দেখিনি। তাই বোধহয় ন্যায়-অন্যায় বুঝতে শিখিনি। যা করেছি ন্যায় ভেবেই করেছি।

—তুমি যে অন্যায় করেছ সেটা বুঝতে আইনের বই পড়ার দরকার হয় না। পাপপুণ্যের বোধ সবারই আছে।

—পাপপুণ্য আর ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে কি ফারাক্ হুজুর?

—পাপ মানেই অন্যায় আর পুণ্য মানেই ন্যায়।

—তাহলে হুজুর আপনার কাছে আমার বিচার হল কেন? যারা আইনের বই পড়েনি অথচ পুণ্য করেছে, তাদের কাছেও তো বিচার হতে পারত?

—তা হয়তো…

—তাহলে হুজুর আপনি সেই ব্যবস্থাই করুন।

—কেন? তুমি কি মনে করছ তাহলে রায় পালটে যাবে! আমার বিচার কি তোমার পছন্দ হয়নি?

—না হুজুর, তা নয়। আপনি আইনের বই পড়েছেন, সেই হেতু আমার

কাজে অন্যায় পেয়েছেন। আমার মতো যারা ওই কেতাবটি পড়েনি তারা যদি কেউ আমার বিচার করতো তাহলে কিন্তু—হ্যাঁ, একেবারে হক্ কথা—তারা কখনোই আমার কোন দোষ খুঁজে পেত না।

—কেন ?

—কারণ আমিও কোন দোষ খুঁজে পাইনি এখনো। পাপ-টাপও নয়।

—তাই নাকি ! মানুষ খুন করাটা দোষ নয় ? পাপ নয় ?

—সে তো হুজুর আপনিও আমাকে খুন করার আদেশ দিয়েছেন।

—সেটা আর এটা এক হল ? তুমি মানুষ খুন করেছ বলে সেই কারণে তোমার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

—হুজুর, আমি যাকে খতম করেছি, সে শয়তানটা একটা কেন, পাঁচটা খুন করেছে।

—সে কী করেছে জানবার দরকার নেই। তুমি নিজে হাতে তাকে এ-শাস্তি দিতে পার না।

—হুজুর তাহলে সময় মতো সে শয়তানটাকে শাস্তি দিলেন না কেন ? তাহলেই তো ল্যাটা মিটে যেত, সেও খুন করতে পারত না আর আমাকেও আর···

—শোনো শোনো, আমি কি করছি না-করছি সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু কেউ কখনো নিজে হাতে আইন তুলে নিতে পারে না। আমি যে তোমায় মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি, সেটা আমার খুশি মতো নয়। সমাজ আমাকে আদেশ দিয়েছে, সেই আদেশ আমি পালন করেছি। আমার পিছনে সমাজ আছে, তোমার পিছনে কেউ নেই।

—আজ্ঞে না হুজুর। এটা সঠিক নয়। সবাই ছিল আমার পিছনে—হরি, মধু, শ্যাম···

—কিন্তু ওরাই তো আর সমাজ নয়।

—তাহলে সমাজ কারা হুজুর ?

—সভ্য শিক্ষিত মানুষ—দায়িত্বজ্ঞানপূর্ণ দশজনের প্রতিনিধি—

—যেমন ধরুন আমি যেটাকে সাবাড় করেছি···

—হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

—অনুমতি দেন তো একটা ভাল কথা বলতে পারি। আপনি শুধু আমাকে

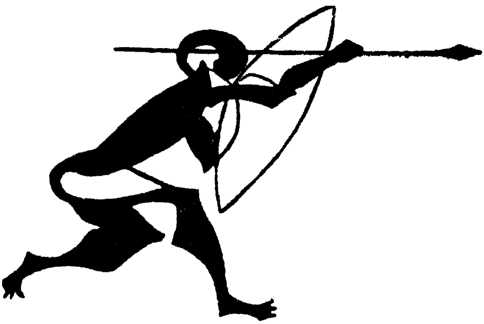
মেরে ভুল করছেন কিন্তু। আমার পিছনে যারা ছিল তাদের প্রত্যেককে আপনার ধরা উচিত। না হলে ঘোর বিপদ আছে।

—কেন?

—সেইটাই তো স্বাভাবিক হুজুর। সমাজের একজনকে সাবাড় করার জন্যে আপনি আমাকে খুন করছেন। কাজেই আমার পেছনের ওরাও এবার ওদের একজনকে খুন করার জন্য···

বিচারক হঠাৎ হুঙ্কারে ফেটে পড়লেন। চমকে গেল রাজীব। সেপাইরা ছুটে এসে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল।

# হাজার রজনীর উপহার



—আগে শুনি আমাদের কি প্রাইজ দিচ্ছেন।

—তা কখনো বলা যায়! সিক্রেট। টপ সিক্রেট!

—না দাদা, না—বলবেন না। বললেই তো আকর্ষণ কমে যাবে। কিন্তু তা বলে আবার রূপমহলের ওদের মতো করবেন না। ওরা পাঁচশো রজনীতে ধুতি চাদর আর মানপত্র দিয়েছিল আর্টিস্টদের।

এবার কোলাহল। আপত্তি ও সমালোচনা।

জগৎরূপা থিয়েটার বাজারী ভিড়ে হারিয়ে যেতে পারে না। সেটা তার উপর্যুপরি সাফল্য থেকেই প্রমাণিত। যে নাটকই ধরে হাজার রজনী পার করে। মালিক তথা ম্যানেজার তথা নাট্যকার আশুনাথ লাহিড়ীকে জিজ্ঞেস করলে উনি বলেন, 'চোখ খোলা রেখে চলতে হয়, বুঝলেন? কালের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। মডার্ন মন চাই। শুধু থিয়েটার কেন, কোন ব্যবসাই এখন পুরনো পথে চলতে পারে না। যাদের নিয়ে কাজ করছি তাদের সঙ্গে আপন ভাইয়ের মতো সম্পর্কই যদি না হয়......'

কথাটা অত্যুক্তি নয়। মিথ্যে কথার জাল বুনে তিক্ত বাস্তবকে ঢাকার চেষ্টাও নয়। লাহিড়ীর থিয়েটারে যারা একবার কাজে ঢুকেছে সহজে কেউ

ছেড়ে যায় না। শিল্পী থেকে স্টেজ্ হ্যাণ্ড বেয়ারা পর্যন্ত সবাই স্বীকার করে আর পাঁচটা পেশাদারী নাট্যমঞ্চ আর জগৎরূপা এক নয়। লাহিড়ী নিজের মুখেই বলেন, 'তা বলে কি পকেটের পয়সা থেকে আপনাদের দিচ্ছি? না মশাই, দান খয়রাতি করতে আসিনি। আমি চাই রোজগার, আপনারাও বেশী পান। তাতে আমিও ঠকব না, আপনারাও লাভবান হবেন।'

শুধু এই দর্শনের জোরে, মালিক কর্মচারীর হৃদ্যতাকে সম্বল করে নিশ্চয় মা লক্ষ্মীর পদচিহ্ন পড়ত না। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির অবদানও নেহাত তুচ্ছ নয়। অপেশাদার নাট্য সংস্থাদের জোরালো বক্তব্য নিয়ে গতানুগতিকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা দেখে পেশাদাররা ঠোঁট বেঁকিয়ে বড়ে মিঞাকে আরেক পাত্র অর্ডার দিত প্রথম দিকে। কিন্তু তারপর টনক নড়তে সময় লাগেনি। মাছি তাড়াতে হলে উপায় খুঁজে বার করতেই হবে। অপেশাদারদের কাবু করতে তারা প্রমোদের রঙ ও মাত্রা আরো উগ্র করল। কাঁচি ধুতি বাঁ হাতের টানের তাঁদের উরুপ্রদেশ আরো কিছুটা অনাবৃত করল এবং তারা ধোঁয়া ছেড়ে গাল কাটল, 'দেখি শালা, পাবলিক আসে কিনা—তিন টাকায় ক্যাবারে দিচ্ছি!'

লাহিড়ী কিন্তু ও পথ মাড়াননি। বিচক্ষণ লোক। এখন না হয় সাদায় কালোয় স্বাস্থ্যবতীদের সুপুষ্ট রেখাগুলো খবরের কাগজে পাব্লিকদের চোখ টানছে। কিন্তু সেও পুরনো হতে আর ক'দিন? ক্যাবারে ফেল্ করলে তারপর? না, এটা আমেরিকা নয় যে আরো এক ধাপ নামবার সুযোগ আছে। লাহিড়ী সুস্থ জীবনবোধের নাটককে অবলম্বন করেছেন, সপরিবারে দেখবার মতো। বিদ্রোহ বিপ্লবের হুঙ্কার নেই কিন্তু সামাজিক অবক্ষয় আছে, অবক্ষয়ের মধ্যেও হাসি আছে জীবন আছে। গি্ ইন্ ওআন্। কলকাতার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মনের মতো।

নাটক নির্বাচনে ও শিল্পী ও কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে লাহিড়ী যেমন ভুল করেননি তেমনি হাজার রজনী উদযাপনের ক্রিয়াকাণ্ডেও খরচের অঙ্কটা বিশাল আকার নিলেও জমার দিক্টা তাঁর অজানা নয়। এটা সার্থক ইনভেস্টমেণ্ট। প্রচার হচ্ছে নাটকের, প্রচার হচ্ছে নাট্যসংস্থার নাম। না হলে তাঁরা হাজার রজনী কিভাবে উদ্যাপন করছেন, সেই কথা কি সপ্তাহে পনের মিনিট করে প্রচার করার জন্য রেডিও কোম্পানির ঘরে কেউ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা তুলে দেয়!

উঠতি নাট্যপ্রতিভা সমর বলল, 'আচ্ছা লাহিড়ীদা, হাজার রজনীতে তো একটা মাত্র পাব্‌লিক শো হচ্ছে, তাই না?'

—হ্যাঁ, সেকেণ্ড শো-টা শুধু গুণীজনদের জন্যে। মানপত্র···

—কিন্তু তাহলে রেডিওর প্রোগ্রামটা তো এবার বন্ধ করে দিলেই হয়। সেদিনকার সব টিকিট তো বিক্রি হয়ে গেছে, আর···

—কি বলছ তুমি? প্রোগ্রামটা কি পপুলার হয়েছ জানো? হবে না কেন বলো, সাসপেন্সটা বজায় রেখেছি যে। সেদিন কে-কে অনুষ্ঠানে আসছে, মানে ফিল্মস্টাররা, জানবার জন্যে লোকে একেবারে······ ফি রেডিও প্রোগ্রামে মাত্র একজনের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে কিনা!

—লাহিড়ীদা, সেদিন কিন্তু ভিড় সামলাতে······

—আর সেইটাই তো চাই। তবে, পুলিশের খোদ বড় কর্তাকে বাড়ি গিয়ে নেমন্তন্ন করে এসেছি। তিনি যখন অভয় দিয়েছেন আমাদের আর চিন্তা করার কি আছে। যাক্‌গে, পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। যে জন্যে আজ সবাইকে ডেকেছি, সেটা বলি। হাজার রজনী উদ্‌যাপনের ব্যাপারে আর কারুর কোন সাজেশান থাকে তো বলুন। বা কোন সমালোচনা। এখনো দিন পনেরো সময় হাতে আছে। ভাল কথা, আমন্ত্রিত শিল্পী ও নাট্যজগতের মান্যগণ্যদের লিস্টটা আপনারা সবাই দেখেছেন তো? কোন নাম বাদ পড়ে থাকলে বলবেন।

সুধীরবাবু চেয়ারে ঘাড় ঠেকিয়ে আধশোয়া হয়ে পড়েছিলেন। এমনিতেই ক্ষীণকায় তার ওপরে গ্যাস্ট্রিকের রুগী। সারাদিন বন্ধ ঘরে বসে শুধু কলম চালানো যে কী কষ্টকর, দেখলেই বোঝা যায়। সুধীরবাবু মাথা না তুলেই বললেন, 'নাটকের লোকজনের তো হিল্লে হল। গরীব মানুষদের জন্যে কিছু হবে না? এই ধরো—পাড়ার চায়ের দোকানের হারু অশোক, এরা রয়েছে। রিক্সাওলাগুলো—'

কথা শেষ করলেন না সুধীরবাবু। তার প্রয়োজনও ছিল না। এই দরদী মনখানাই তাঁর অ্যাসেট্। দরদ বিনা অমন ডায়ালগ্ জমাতে পারে কেউ?

সবাই হই হই করে উঠল। সুধীরদা ঠিক ধরেছেন। ওদের বাদ দিলে আনন্দধারা বইতে পারে না। সবার মনে খুশীর রঙ ধরাতে না পারলে সব আয়োজনই বৃথা।

—লাহিড়ীদা, আমি বলি ওদের সেদিন দুপুরে পেট পুরে খাওয়াবোর ব্যবস্থা করা হোক্।

সুধীরদা ঠোঁট উল্টে ঘাড় নাড়তে লাগলেন, 'না হে না, ওসব পাত পেড়ে ক্যাঙালী ভোজন-টোজন এখন আর চলে না। সেকেলে ব্যাপার—খুব দৃষ্টিকটু।

—আমরা যদি প্যাক্ লাঞ্চ দিই...

অধীর রাস্তায় পাত্ পাতার ছবিটাকে প্যাকেট যোগে বিদায় করতে চায় আধুনিক কেতা অনুসারে।

লাহিড়ীর মনঃপূত নয়, 'খুব হ্যাকনিড্ হয়ে যাবে না?'

তাছাড়া এটা স্রেফ টাকার শ্রাদ্ধ। আজকের দিনে রিক্সাওলা ঠেলা-ওলাদের অন্ন বিতরণের ছবি ছাপাটা যে একেবারেই অচল হয়ে গেছে।

হঠাৎ আইডিয়া ঠিক্‌রে এল শ্যামলালের মাথা থেকে, 'লাহিড়ীদা, গেঞ্জি চালিয়ে দিন।' ওর কথাবার্তাগুলো এখনো একটু কাটা কাটা রয়ে গেছে। মোড়ের রকের আড্ডা থেকে লাহিড়ী ওকে প্রায় তুলে এনেছেন। কিন্তু সাইড্ রোলে পার্ট করার পরেও কিছু এনার্জি বাড়তি থেকে যায়। শো, রিহার্সাল না থাকলে, পাড়ায় দাদাগিরি বন্ধ থাকে না। তাছাড়া ওর ইমেজ্‌টা এখন আরো উজ্জ্বল।

—গেঞ্জি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ গেঞ্জি। ওদের খুব কাজে লাগবে। হাজার রজনীতে হাজার গেঞ্জি দেওয়া হোক্।

শ্যামলালের আইডিয়াটা খারাপ নয়। তবে খরচের হিসেবটাও দেখা উচিত।

লাহিড়ীর সামান্য দ্বিধাটুকু কাটিয়ে মুস্কিল আসান করে দিলেন সুধীরদা, 'ভাল বলেছে শ্যামলাল। সত্যিকার কাজের কাজ হবে। তবে এমনি গেঞ্জি দিলে তো চলবে না, ছাপিয়ে নিতে হবে। এই ধরো—লেখা থাকবে, 'হাজার রজনীর উপহার, জগৎরূপা থিয়েটার'।'

এরপর এই প্রস্তাব সর্বজন সমর্থন ধন্য হয়ে গৃহীত হতে বাধ্য।

লাহিড়ীদা মনে মনে হিসেব করে দেখে নিয়েছেন, রিক্সাওলার অঙ্গে একটা গেঞ্জি উঠলে কম পক্ষে তিনটি মাস তার আসন অটল।

অজয়কে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হল। গেঞ্জির ব্যাপারটা ওই দেখবে। তবে

হ্যাঁ, ভালো জায়গায় ছাপানো হয় যেন। রঙটা যেন পাকা হয়। অন্ততঃ তিনটে মাস যেন টেকে।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব। মঞ্চের ডান দিকের গেট দিয়ে সারি বেঁধে রিক্সাওলা ঠেলাওলারা ঢুকছে, খালি গায়ে। মহামান্যা প্রধান অতিথিনীর হাত থেকে গেঞ্জি গ্রহণ করছে, তাঁর স্মিত হাসিটি দেখতে দেখতে গেঞ্জিটি গায়ে গলিয়ে নিচ্ছে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসতেই, সুধীমণ্ডলী হাততালিতে ফেটে পড়ছে। মঞ্চের আলোয় বুকে পিঠে লাল রঙে 'জগৎরূপা' আর নীল রঙে 'হাজার রজনীর উপহার' ঝলমল করছে। তারপর আবার পরের জন। জনা দশেক ভলান্টিয়ার হিমসিম খাচ্ছে নিয়ন্ত্রণ রাখতে। তাও তো মাত্র একশো জনকে শুধু অনুষ্ঠানের দিন উপহার বিতরণ করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ন' শো গেঞ্জি বিভিন্ন অঞ্চলে বিতরণ করা হবে।

সাতাশি জন পুরস্কার গ্রহণ করার পর অঘটন ঘটল। অষ্টআশিতম প্রাপক হাত পেতে গেঞ্জি নিল, গায়ে চড়াল কিন্তু হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রস্থান করল না। সে আবার পিছন ফিরে উপহারদাত্রীর সামনে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল, মুঠো খুলে, একমুখ হাসি।

উপহারদাত্রীর সুমিষ্ট চাপা স্বর মাইক বাহিত হল, 'আমরা ভাই একটা করেই গেঞ্জি দিচ্ছি যে। অনেক লোক তো, সবাইকেই দিতে হবে…'

প্রাপক ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, 'নেহি, নেহি, গেঞ্জি নেহি মাঙতা…'

বলে কি খোট্টাটা? তাহলে কি চায়? উপহারদাত্রীর দৃষ্টি উদ্যোক্তাদের সন্ধান করে।

মাননীয়ার করকমলে গেঞ্জি যোগানদার ব্যক্তি এবার এগিয়ে আসে, 'আরে পথ ছাড়ো না! পিছনে কত লোক…'

'নেহি…'

'কিঁউ নেহি?'

'রূপেয়া দেনে পড়েগা। হাঁ!'

'রূপেয়া?'

সারা হল জুড়ে গুঞ্জন।

'হাঁ হাঁ রূপেয়া। ছাতিমে তুমহারা খেটাব্ কো নাম্ লেকর্ অ্যাড্‌ভিটিজ্

করে গা ক্যা মুফৎসে ?…ও নেহি হোগা…অগর রূপেয়া দো নহি তো—এ লো তুম্‌হারা গঞ্জি…'

গুঞ্জন এখন সোরগোল। অকৃতজ্ঞারও একটা সীমা থাকা উচিত। বিদ্যাসাগর সাধে বলেছিলেন, উপকার যে-করে, নিন্দাটাও তারই প্রাপ্য। কত লোক এই গেঞ্জি পেয়ে বর্তে যাচ্ছে…

হেঁড়ে গলা নির্বিকার। টাকা না পেলে·· গেঞ্জি খুলবে বলে দু' হাত উঁচু করে…বিকট দৃশ্য…

শ্যামলাল ছুটে আসে স্টেজে।

'আরে টাকা তো বাইরে থেকে দেওয়া হবে। এখানে শুধু গেঞ্জি। চল্‌ চল্‌—'

শ্যামলাল ওকে টাকা পাইয়ে দিতে ডেকে নিয়ে গেল। বাকী ন' জন ভলান্টিয়ার তখন একত্রিত হয়েছে সব পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেবার জন্যে।

# দুরারোগ্য



অফিস ছুটির পর সহকর্মীদের সঙ্গে রাস্তা পার হচ্ছিলেন হরিহর সরকার। অকস্মাৎ সরব বিজ্ঞপ্তি সমেত এক ধাবড়া থুতু ছুঁড়ে দিলেন। বিরক্তি বললে ভুল হবে, অস্বস্তির বোধটাই সঙ্গীদের কাবু করে। ট্র্যাফিক পুলিশটাকেও এক পা পিছিয়ে এসে চোখ তুলে তাকাতে হল কারণ থুতুর ডেলাটা তার বুটওলা পায়ের সর্বাধিক ছ' ইঞ্চি দূরে নিক্ষিপ্ত। উর্দীপরার অবশ্যম্ভাবী মন্তব্যের মুখে লালবাতি জ্বলে ওঠায় সকলে রাস্তা পারাপারের সুযোগ পেয়ে গেল।

বিল সেকশানের অসীম না-না করে বলেই ফেলল, 'দাদা, কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি।'

হরিহরবাবু অমায়িক, 'বলো হে বলো, এত কিন্তু কিন্তু করছ কেন?'

'আপনি যেভাবে থুতু ফেললেন না, ওফ্—পুলিশটা কটমট করে…'

'থুতু! থুতু ফেলেছি!' হরিহর বাবু রীতিমতো বিস্ময়ে পড়লেন।

অসীমের ভুরু কোঁচকায়। সত্য হাসে। 'বাপ্ রে—যে ওয়াক্ তুললেন! অন্নপ্রাশনের ভাত চাল হয়ে…'

'তাই নাকি!' সরকার মশাই নির্লিপ্ততার সুর কাটেন। 'কি জানি ভাই, আমি তো খেয়াল করতে পারছি না। হবে হয়তো, অন্যমনস্ক ছিলাম।'

অবিশ্বাস করার মতো কোন কারণের অভাবে একটা 'যাইহোক' জুড়ে শুরু করতে হল অসীমকে, 'যাইহোক, একটু খেয়াল করে থুতু ফেলবেন। যেখানে-সেখানে...'

অসীম তখনো দাঁড়ি টানেনি। বৌবাজারের যানবাহনের স্রোতটা ইতিমধ্যে রুদ্ধ হয়েছে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ বাহীদের সৌজন্যে। ফুটপাথ ছুঁয়ে পুলিশের একটা কালো জিপ দাঁড়িয়ে এরিয়ালের টিকি খাড়া করে। হরিহরবাবু রাস্তায় নেমে পড়লেন। অশ্বারোহী যথা জিপের সম্মুখে আসীন সার্জেণ্ট ফুটবোর্ডের রেকাপে বাঁ পা রেখেছিল। সার্জেণ্টের সুদৃশ্য পায়ের অনতিদূরে এক মুখ থুতু হালকা করে হরিহরবাবু আবার ফুটপাথে উঠে এলেন মুহূর্তের অবসরে। ওয়াকের বহরে সচকিত সার্জেণ্ট একটি নিরীহ ধুতি-পাঞ্জাবীকে শুধু আপনভোলা হেঁটে যেতে দেখল।

'এটা কিরকম হল ?' অসীম বেশ ক্ষুব্ধ।

'কি হল ভাই ?' অবুঝের সরল উচ্চারণ।

'কী মুস্কিল ! আবার অমনি করে থুতু ফেললেন !'

'শুধু কি থুতু ফেলা ! হরিহরদা আবার পুলিশের দিকে টিপ করছেন।' সমীরের সংযোজন। সময় অসময়কে তালগোল পাকিয়ে ফেলতে বড়ই ওস্তাদ সমীর।

সমীরের হাসি অসীমকে ক্রুদ্ধ করে, 'চুপ করবি তুই। সব তাতে ফাজ্‌লামো ভাল লাগেনা।'

অসীমের ক্রোধ সমীরকে নিরস্ত করলেও হরিহরদাকে সামলাতে পারল না। আমহার্স্ট স্ট্রিট ও তারপর শেয়ালদার মোড়ে ট্র্যাফিক পুলিশ ও হোমগার্ডের পদপ্রান্তে দু' মিনিটের ব্যবধানে দু'বার থুতু বর্ষণ করে তিনি বৈদ্যুতিক চমক্ লাগিয়ে দিলেন। অসীমকে মনে মনে স্বীকার করতে হল সমীরের ফাজিল সিদ্ধান্ত অজান্তে হলেও সত্যভেদ করেছে।

অফিস গুঞ্জরিত পরের দিন। হরিহরদা'র অভিনব কীর্তিকথা হাসি চিন্তা ও কল্পনার জাল বিছিয়ে প্রত্যেককে বন্দী করেছে। অফিসের ছুটির ঘন্টির পরোয়া না করে কয়েকজন হরিহরবাবুর সঙ্গ লাভের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ওভারটাইম অবস্থান নিশ্চয় কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে দেবে কৌতুক। মাতৃভূমি, দেশবাসী ও রাজনীতি সম্বন্ধে অসীমের জ্ঞানগম্যির কথা সুবিদিত।

অবস্থার গাম্ভীর্য অনুধাবন করে সকলকেই সে কিঞ্চিত অগ্রিম শাসন করে রাখল। রাস্তাঘাটে পুলিশকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশার ফলাফল অশুভ হবারই সম্ভাবনা।

কৌতুক প্রশয় পেল না তবু হরিহরবাবু প্রমুখ পদব্রজে শেয়ালদা-যাত্রীদের দল ভারী করা রোধ করা গেল না। বন্যপশু দর্শনার্থীদের মনোবাসনা চরিতার্থ করল কাজিরঙ্গার গণ্ডার। হরিহর বাবু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই প্রথম ট্র্যাফিক পুলিশটিকে আওতার মধ্যে পেলেন এবং তার পদপ্রান্তে থুতুর ডেলা স্থাপন করলেন।

হাসির লহরা না উঠলেও তারই ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনিরা অনায়াসে সকলের মনোভাব ব্যক্ত করল।

ঘটনার দ্বিতীয় অপরিমার্জিত সংস্করণ পাওয়া গেল মিনিট দুয়েকের ব্যবধানে। বিরক্ত বিহারী পুলিশটি সম্মানবোধ সম্পন্ন বোঝা গেল। প্রত্যক্ষ-দর্শীর হাসি প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে, 'কেয়া দিল্লাগী হোতা হ্যায় কেয়া?' সে হরিহর বাবুর দিকে ধাবিত হল।

একটি 'অ্যাঁ!'-যোগে হরিহর বাবু নিষ্পাপ মুখ তুললেন।

অসীমের মধ্যস্থতা একটা ঠেকা দেবার চেষ্টা করল, 'কি হয়েছে ভাই—'

'দেখিয়ে ইধার্—' হাতের লাঠিটা অকুস্থল নির্দেশ করল।

জনতার জঙ্গল ইতিমধ্যেই আরো ঘন হয়ে উঠেছে। থুতু! পুলিশের মুখের সামনে থুতু ফেলেছে! অভিনব অস্বাভাবিকের জ্বালানীতে রৈ-রৈ করে ওঠে মন্তব্য। অসীম উদ্বিগ্ন। হরিহরবাবুর হাত ধরে জটলা থেকে বেরিয়ে পড়াটা আশু কর্তব্য। আমূদে জনতার হাসিতে পুলিশের ক্রম উত্তেজিত আত্ম-সম্মান হরিহর সরকারের হাত পাকড়ে ধরে।

'চলো মেরা সাথ্!'

অতঃপর জনতার তার্কিক মূর্তি। অকারণে একজনকে টেনে নিয়ে যাবে রাস্তা থেকে! কলকাতা তার রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে স্মরণ করেছে। ফুটপাথ ছাপিয়ে ভিড় রাস্তায় গিয়ে পড়ে। বৌবাজারের ভিড়ে চেপটা হবার আশঙ্কায় আর্ত আবেদনে শিউরে ওঠে যানবাহন।

সংকটের কেন্দ্র খুঁজে নিয়ে টহলদারী পুলিশ সার্জেণ্ট শব্দের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসেন। মোটর সাইকেল রাস্তার ধারে দাঁড় করিয়ে তিনি দৃশ্যে প্রবেশ করেন। মোজেসের বাহুর ইঙ্গিতে সমুদ্র বিভক্ত।

'কেয়া হুয়া ?' ঈশ্বরদত্ত কর্তৃত্ববাচক প্রশ্নের বজ্রপাতে কোলাহল মুমূর্ষু হয়ে পড়ে।

'দেখিয়ে সাব্‌, ইয়ে আদ্‌মী—'

প্রদর্শনী হরিহরবাবু আকর্ষিত হন এবং পুলিশ সার্জেণ্ট স্বয়ং আরো এক পা ব্যবধান কমিয়ে ফেলেন। একমুখী গতির যোগফলে বিপজ্জনক ছয় ইঞ্চি দূরত্বটি সৃষ্টি হতেই হরিহরবাবু কালবিলম্ব না করে সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করেন। সার্জেণ্টের কালো ঝকঝকে মোটাসোটা চামড়ামোড়া পা-টিকে অভিবাদন জানায় থুতুর ধাবড়া।

সার্জেণ্টের থমথমে মুখের চেহারা দেখে হরিহরবাবুর সহকর্মীরা আসন্ন বিপদকে ছেঁকে ধরল।

'শাট্‌ আপ্‌। কথা বাড়াবেন না। সকলেই ঝামেলায় পড়বেন।' শাসন ব্যবস্থা হরিহর বাবুর হাত ধরে টান দেয়।

অসীম ব্যাগ খুলে নিজের পরিচয়পত্রখানা বার করে এক রকম জোর করে সার্জেণ্টের হাতে গুঁজে দিল। রবার স্ট্যাম্পের অশ্বারোহী সরকারী সিংহ নীল চাউনি হেনে সার্জেণ্টকে নরম করে, 'আপনারা এক অফিসে কাজ করেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এভাবে ওনাকে ধরে নিয়ে যাবেন না স্যার।'

'তারপর বেপাত্তা হয়ে গেলে—'

'আমরা এতগুলো লোক গ্যারাণ্টি থাকছি। নাম, ধাম, অফিসের ঠিকানা —সব লিখে দিচ্ছি। সরকারী চাকরি। পালাবার কি পথ আছে !'

জটলার স্ফীতি ও যানবাহনের অধৈর্য অহরহ কাকুতি মিনতি সার্জেণ্টকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

অসীম আর দ্বিরুক্তি না করে একটি ট্যাক্সি ডেকে সরকার মশাইকে নিয়ে উঠে বসল।

হরিহরদাকে আপন সংসারে গচ্ছিত করে বৌদিকে বারান্দায় ডেকে ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা পেশ করল অসীম। হলুদবাটা আঙুল আঁচলকে পাকিয়ে পাকিয়ে নীল ডুরেকে যাচ্ছেতাই হলদে শাস্তি দিল, ভেতরের ঘর থেকে ছেলেদের সাতেক্কে সাত, সাত দু'গুণে চোদ্দ-শব্দরা ভুরিভুরি উচ্চারিত হল, মেয়ের গলায় তোমায় সাজাব যতনের কলি সুর খুঁজে পাবার অনন্ত প্রয়াসে প্রায় হাঁফিয়ে পড়ল, তবু বৌদির নির্বাক চিন্তা তাঁর দুর্ভাবনাকে ক্রমেই

বাড়িয়ে তুলবে কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করতে পারবেনা জানা গেল। 'এমন নিপাট ভালমানুষের একি সর্বনেশে কাণ্ড!'

হাতির মতো গোদা গোদা গুরুতাকে দু'চারটে মামুলি সান্ত্বনার বাক্য শুনিয়ে হটিয়ে দিয়ে অসীম ফেরবার পথ পরিষ্কার করে। কপালদোষের প্রসঙ্গ ওঠার আগেই কপালে জোড়া হাত ঠেকিয়ে বিদায় নেয়।

আই. বি. বিভাগ প্রেরিত তদন্তকারী যথা নিয়মে অফিসের সেক্‌শান অফিসারের মুখোমুখি হলেন। হরিহর বাবুর কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট বেরোল গড্‌রেজের ইস্পাতগড়া নিরাপত্তার গহ্বর থেকে। শব্দরাজ্যে নিপুণ খানাতল্লাশি সত্ত্বেও নষ্টামির পোকা বা তার বিষ্ঠার সন্ধান মিলল না। স্বতঃপ্রবৃত্ত সেক্‌শান অফিসার কর্তৃক হরিহর বাবুর নিষ্কলুষ সরকারী বেতনভুক চরিত্র আবেগ সহযোগে অ্যাটেস্‌টেড হল। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে হরিহর বাবুর গাফিলতি বেনজির।

তদন্তকারীর মনঃক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। হরিহর বাবুর গৃহসংলগ্ন থানার রিপোর্টও এমনি ফরসা সতীপানা, রহস্য ও আকর্ষণ শূন্য। হরিহর বাবুকে উপভোগ করতে হলে লালবাজারে আরো জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ছুঁড়ে দিতে হবে।

সেক্‌শান অফিসার কাকতালীয় জাতের দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেও তদন্তের ইচ্ছার সামনে দাঁড়ি টেনে দিতে পারলেন না।

'আপনিই বলুন না, মানুষ কখন থুতু ফেলে? নোংরা টোংরা দেখলে বা দুর্গন্ধ নাকে এলে, তাই না? তাহলে বলুন, পুলিশের গা থেকে উনি দুর্গন্ধ পাচ্ছেন, কিম্বা পুলিশকে ওনার নোংরা বলে মনে হচ্ছে! দেখুন—এসব ব্যাপার আমরা ঠিকই বুঝি।' প্রভাতের উল্লেখে পাখির কূজন স্মরণে আসে, না প্রাতঃকৃত্যের প্রয়োজন, এ-জাতীয় কোন মতদ্বৈধেরও সুযোগ পেলেন না সরকার মশাই। তাঁর লালবাজার যাত্রা নিবারণ করা গেল না।

অফিস কর্মীদের পৌনঃপুনিক আবেদন সেক্‌সান অফিসারকে ডাইরেক্‌টারের শরণাপন্ন করাল। লালবাজারের ঊর্ধ্বতম মহলে ডাইরেক্‌টারের ব্যক্তিগত আলাপ নিবেদিত হল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই লালবাজার ফোনে সৌজন্য বিনিময় করল। হরিহর বাবু আই. বি. অফিসার সন্দর্শনে থুতু বর্ষণ না করায় সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছিল। এখন জানা গেল লালবাজারে গাড়ি থেকে নেমেই তিনি স্বরূপে সগর্জনে পুলিশের বিভিন্ন বুটজুতোকে জলীয় গোলা দেগে আক্রমণ করেছেন। নিদেনপক্ষে চারবার। তারপর বিভাগীয় প্রধানের কক্ষে ফিনাইল

ধোলাই অ্যান্টিসেপ্‌টিক মেঝের ঝকঝকানিকে একই উপায়ে কলুষিত করে অশ্লীলতার চরম পরিচয় দাখিল করেছেন।

এরপরেও ডাইরেক্টরের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের কারণে বিপর্যয় সাময়িক ভাবে হরিহর বাবুকে অব্যাহতি দিল। রক্তের সম্পর্কের চেয়েও বড় আমলা-আমলা ভাই-ভাই সম্পর্কের সুবাদে তিনি উচ্চ পদাসীন এক পুলিশ অফিসারকে (নাম গোপন) অনুরোধ করায় কাজ হল। তিনি স্বয়ং গ্যারান্টি হিসাবে দাঁড়াবার বিড়ম্বনা পোয়াতে সম্মত হলেন এবং আই. বি. বিভাগ হরিহর বাবুকে একজন প্রখ্যাত মনোবিশ্লেষকের চিকিৎসাধীনে রাথার স্বস্থ সিদ্ধান্ত নিল।

কোন ফল হলনা। স্ত্রীর চোখের জল, বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, পুলিশের নিরন্তর ভীতি প্রদর্শন আর চিকিৎসকের দাওয়াইয়ের তোয়াক্কা করেননি হরিহর সরকার। পুলিশের কালো বুটজুতো পরিবেষ্টিত একটি অদৃশ্য বৃত্তের কিনারায় থুতু নিক্ষেপ অভ্যাস করে চলেছেন।

একমাস বাদে প্রাপ্য মেডিকাল রিপোর্ট এল দেড় মাস পরে। বিশেষজ্ঞ রোগটিকে সনাক্ত করতে না পারলেও এটি যে একটি রোগ সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট আর কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেনি।

পুলিশমহল রিপোর্ট হস্তগত করেই আরো বিশদ ব্যাখ্যা তলব করল। কোন্ পরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ঘোষণা করছেন যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত?

চাষার বাচ্চাকে পারমাণবিক পদার্থ বিজ্ঞানে আগ্রহী করে তোলার উৎসাহ নিয়ে বিশেষজ্ঞ মশাই শিশুপাচ্য ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানকে তরল করে দিলেন, 'পুলিশ নয়, পুলিশ বেশধারী যে-কোন ব্যক্তি রোগীর সামনে উপস্থিত হলে সেই দৃশ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির নয়ন পথে মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছয়। তারপর স্নায়ুকেন্দ্রের দুর্বোধ্য এক ইঙ্গিতে বিশেষ একটি গ্রন্থি সক্রিয় হয়ে তাঁর মুখে নিষ্ঠীবনের নিঃসরণ ঘটায়। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সেই সময় তাঁর মুখের ভিতর এত অধিক পরিমাণে নিষ্ঠীবন সঞ্চিত হয় যে তা কোনমতেই অনির্দিষ্টকাল মুখ-গহ্বরে ধারণ করা সম্ভব নয়।'

আই. বি. বিভাগের প্রধান রিপোর্ট পড়ে তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত করলেন। কেসটি তাঁর মতে বিপজ্জনক। বিশেষতঃ রোগটি সংক্রামক কিনা জানা নেই যখন। এই দুর্জ্ঞেয় রোগের বিস্তৃতি ঘটলে পুলিশ বাহিনীর নৈতিক দৃঢ়তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সেনের কাছে আর্জেন্ট চিরকুট ছুটল জিজ্ঞাসা

নিয়ে। তিনি এই রোগের জীবাণু সনাক্ত, উপসর্গ নির্ণয় ও রোগ নিরাময় করতে পারবেন কিনা এবং তার জন্য কত সময় লাগবে।

চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে রোগটি অনন্য। তবু ডক্টর সেন শেষ চেষ্টা হিসেবে আরো দেড় মাস সময় নিলেন। রোগ নিরাময় যদি নাও হয়, এই বিষয়ে তিনি একটি গবেষণা পত্র লিখে ফেলতে পারবেন।

আশৈশব হরিহর সরকারের জীবনেতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সংগ্রহ, বিশ্লেষণ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা তাঁর স্নায়ুব্যবস্থাকে বারংবার শিহরিত করেও রোগের কারণ নির্ণয় করা গেল না। ডক্টর সেন নিজ ব্যয়ে তাঁকে নিয়ে রাজ্যান্তরে ভ্রমণে বেরোলেন, কিন্তু তাও বিফল হল। হরিহর বাবুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের নিরাশ করে ডাক্তার জানালেন, শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, বিহার উড়িষ্যা অন্ধ্র ও কর্ণাটক—এই কটি রাজ্য ভ্রমণ করে দেখা গেছে, পুলিশ বেশধারী মাত্রেই হরিহর বাবুর মুখে নিষ্ঠীবন উৎপন্ন করছে।

নির্ধারিত দেড় মাস অতিক্রান্ত হল। হরিহর বাবুর ভবিষ্যৎ বহু পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। ক্ষমতাবান মানুষের সহৃদয়তায় অবধারিত ঘটনাটি শুধু কয়েক মাসের জন্য মুলতবী ছিল। এবার স্বীকারোক্তি আদায়ের স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ পন্থাগুলিকে স্মরণ করা হল। কিন্তু ভারপ্রাপ্তদের অভ্যাসসিদ্ধ কুশলতা ও শারীরিক পটুত্ব সত্ত্বেও উদ্দেশ্য সাধিত হল না।

আই. বি. বিভাগ পড়ল সমস্যায়। খুনী, তস্কর, অসামাজিক বা সন্ত্রাসবাদী রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে এইসব পদ্ধতির উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই। হরিহর বাবু এরকম কোন গোত্রভুক্ত নয় বলেই কি সুফল হল না? কিন্তু চিরাচরিত প্রথা অনুসারে তাঁকে গোত্রভুক্ত করতে না পারলেও তাঁর বিচিত্র আচরণের ফলে জনমানসে শান্তির রক্ষকদের ভীতিভাব-মূর্তি বিনষ্ট হবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রয়েছে। দেশদ্রোহীদের প্রচারপত্রগুলির সম্মিলিত বিশেষণ-বাহিনীও বোধহয় এই পরিমাণ ক্ষতি সাধনে অপারগ। তৎকালীন জরুরী অবস্থার কল্যাণকর দিকগুলির একটি অন্তত: পুলিশ বিভাগ আবার স্বীকার করল। অনির্দিষ্টকালের জন্য অশান্তি সমেত হরিহর সরকার কারাগারে চালান হয়ে গেল।

ডক্টর সেন দুর্লভ রোগীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করলেন না। তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে একই বার্তা আসে: অবস্থা অপরিবর্তিত। অত্যাচার তাঁর থুতু যোগে লক্ষ্যভেদ করার নৈষ্ঠিক সাধনা ভঙ্গ করতে পারেনি।

তিন মাস কেটে গেছে, এই অবসরে সরকার মশাইয়ের মুক্তিলাভের আশা দাম্পত্য রোমাঞ্চের মতো ঝটপট ফিকে মেরে গেছল। অকস্মাৎ দেশের রাজনৈতিক মহাকাশে নক্ষত্রপতন অপ্রত্যাশিত সুযোগ এনে দিল। বন্দীমুক্তির জোয়ারে হরিহর বাবুও মিশে গেলেন। অশ্রুসিক্ত আত্মীয় পরিজন অন্তরঙ্গ বন্ধুরা অনেকেই হাজির হলেন মুক্তির দিন। উৎফুল্ল ডক্টর সেনও বাদ পড়েননি। কোনো প্রত্যাশা নিশ্চয় তাঁকে অধীর করেছে।

অসীমকে সঙ্গোপনে চাপা স্বরে বললেন, 'আমার ধারণা এবার উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।'

'সত্যি? কিন্তু ব্যাপারটা······'

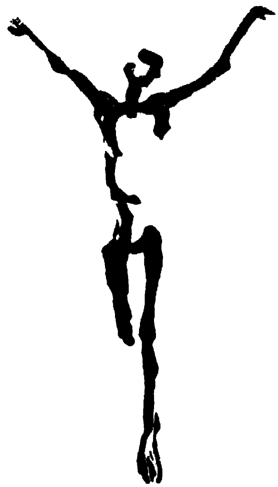
'আপনাদের কাউকেই আমি কথাটা এতদিন বলিনি। জানাজানি হলে হিতে বিপরীত হবার ভয় ছিল। হরিহর বাবুর শোবার ঘরে আমি একটি আঠার বছরের কিশোরের ছবি দেখেছিলাম। ছেলেটির নাম শানু, ওনার খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে। ছবিটির নীচে ছেলেটির জন্ম ও মৃত্যু তারিখ লেখা ছিল। পুলিশ শানুকে····.'

'সেকী!'

'হ্যাঁ, সে এক মর্মান্তিক ব্যাপার। সেদিন সেই দৃশ্যের একমাত্র সাক্ষী ছিলেন হরিহর বাবু।'

হরিহর বাবুর মুক্তিলাভের পর দুটো ট্যাক্সি নিয়ে সবাই বাড়ির দিকে রওনা হল। বামপন্থী সরকারের ক্ষমতাসীন হবার সংবাদ শ্রবণে সবিশেষ উৎসাহ প্রদর্শনের ঠিক দু' মিনিট আঠার সেকেণ্ড পরে আবার পূর্ববর্তী ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। ট্যাক্সির খোলা জানলা দিয়ে মাথা গলিয়ে হরিহর সরকার ট্রাফিক পুলিশের কালো বুটজুতোর ডগা থেকে মেপে ছয় ইঞ্চি ছেড়ে এক ধাবড়া থুতু নিক্ষেপ করলেন।

# বেলুনে কত পদার্থ



পার্কস্ট্রীটের জমিরা চড়া দরে বিকোয়। তাই কোন রকমে যেন ঠ্যাঙটা রেখেই বাড়িটা সড়সড় করে মাথার দিকে বেড়ে গেছে, বহরের ঘাটতি পুষিয়ে নিয়েছে বেওয়ারিশ আলো হাওয়াকে আকাশ থেকে হটিয়ে। পরিবার পিছু চারখানা আস্ত ঘর বরাদ্দ করেও এক বাড়িতে ছাপ্পান্নটা পরিবার এঁটে গেছে। আর সৃষ্টি হয়েছে মিতুকে সামলাবার সমস্যা। মাথার দিকে ন' তলা উঠলে ছাত পাওয়া যায়, কিম্বা ছ'তলা অবতরণের পর কয়েক পা এগিয়ে 'নো পার্কিঙ'-বাঁটওলা চারমুখো আলোর ছাতা ঘিরে একটি চত্তর। কিন্তু সেখানে আবার ধেড়ে খোকাদের ডিউজ-বল্ পেটানো চলছে সমানে। পাঁচ বছরের মিতুর কিছু শক্তি সর্বদাই বাড়তি থাকে। দৌড়ঝাঁপ হুড়োহুড়ি মারফত খরচ করতে না পেরে সেগুলো বায়না হয়ে উত্ত্যক্ত করে।

কুক্—কুক্—কুক্—

বাসার দরজা খুলে মোরগটা এগারো-বার ঘাড় বার করে ডাক দিল। এখুনি এসে পড়বে মিতু। অরেঞ্জ স্কোয়াশে চিনির কিউব চারটে ছেড়ে দিয়ে রাণু তাড়াতাড়ি স্ট্র-এর প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল। মিতু বাবুর জন্য আজকের সার্প্রাইজ।

রাণু দরজা খুলে দাঁড়িয়ে রইল।

রোজ ইস্কুল থেকে ফেরার সময় গরমে ছেলেটা একেবারে ঝলসে যায়। রিক্সার বদলে ট্যাক্সি করে স্কুল থেকে আনা যায় কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া তো লটারীর প্রাইজ!

লাল তীরটা ওপর দিকে মুখ করে জ্বলছে। এক নিবে গিয়ে দুই, দুই নিবে গিয়ে তিন, তিন নিবে গিয়ে চার···

মিতু ছিটকে এল লিফ্‌ট্‌ থেকে। এক ধাক্কায় রাণুকে সরিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। গুণ্ডা ছেলের ধাক্কাগুলো স্নেহ-যোগেও হজম করা সহজ নয়।

হরিপদ ব্যাগ কাঁধে ঘরের ভেতরে পা রাখতেই একটা চিৎকার লাফিয়ে উঠল, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি! তবে রে, আবার হাসি!'

গণ্ডারের মতো মাথা নামিয়ে চার্জ করল মিতু। (ওয়াল্ট ডিজ্‌নের সিনেমা দেখেছে মিতু।) ধাক্কায় হরিপদ কিঞ্চিৎ নড়ে গেলেও তার মুখের হাসি মিলোয়নি। 'ছাখো দিদিমণি, খোকাবাবুর কাণ্ড!'

মিতু হরিপদর ধুতিটা খিমচে ধরল। রাগে চোখ দুটো কুঁচকে ময়না পাখীর মতো হয়ে গেছে।

হরিপদর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়, 'ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে—লক্ষ্মী খোকাবাবু, অমন করোনা—ছেড়ে দাও!' চাঁদমারির কেন্দ্র ভেদ করেছে মিতু।

'মিতু, ছেড়ে দাও বাবা। কি হয়েছে? আমায় বলো না। কি করেছে হরিদা?' রাণু জানে এখন মিতুকে শাসন করার সময় নয়।

'দেখো না, কিছুতেই লিফ্‌টে চড়বে না। গেঁয়ো ভূত কোথাকার। সবাই হাসে। কোনদিন আমাকে স্কুল থেকে আনতে যাবে না।' মিতু হরিপদকে মুক্তি দেয়।

হরিপদকে নিয়ে আর পারা যায় না। নিপাট গোবেচারা হলে যা হয়! ভবানীপুরের পুরনো বাড়ি ছেড়ে আসবার সময় 'বিশ্বাসী' হরিপদ ছাড়া আর কোন পুরনো জিনিস তারা লেজুড় হিসেবে আনেনি। কিন্তু মিতুকে সামলানো ওর কর্মো নয়। তিন বছর হয়ে গেছে পার্ক স্ট্রীটে তবু সব কিছুতে জুজুবুড়ি দেখা আর ঘুচল না। লিফ্‌টে যেন বাঘের বাসা। ছ'তলা সিঁড়ি ভেঙে দিনে অন্ততঃ বিশবার ওঠানামা করতে হয় তাকেই, বয়স হয়েছে, দম বেরিয়ে যায়, দরদর করে ঘামে—তবু লিফ্‌টে চড়া নৈব নৈব চ। মিতুর জেদের কাছে আজকাল অবশ্য মাঝেসাঝে তাকে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে।

'কিরে হরিপদ, কি হল আবার, লিফ্‌টে···'

'কি বলছ তুমি দিদিমণি। কাল দেকোনি, লিফ্‌ যে এইট্‌কে গেছল।' হরিপদ উল্টে রাণুকেই শাসন করে দেয়।

'এইট্‌কে কি, এইট্‌কে? বুদ্ধু!'

'ছিঃ মিতু! বিহেভ ইওরসেল্‌ফ্‌!'

দাঁতের পাটির মাঝ দিয়ে জিভ বার করে বাকী কথাগুলো মিতু নিঃশব্দে উচ্চারণ করল। মিতুর নতুন দাঁতগুলো বেশ সুন্দর উঠছে। এই নিয়ে রাণুর বড় দুশ্চিন্তা ছিল।

'আয়—এদিকে আয়—অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাবিনা?' ইস্কুল থেকে আসার সময় বড্ড গরম করে, নারে!'

'ইস্কুল নয়, স্কুল!' মায়ের ভুল শুধরে দিয়েই ঘরের কোণে মোরগ-ডাকা ঘড়ির লম্বা লম্বা চেনের বেণীদুটোকে সবচেয়ে বড় শত্রু বলে মনে হল মিতুর। কারণ এটাতে তাকে হাত দিতে দেওয়া হয় না।

'মিতু! মিতু!'

মা ছুটে আসার আগেই মৃত্যুদণ্ড জারি হয়ে গেল।

'ছ্যাকো—ছ্যাকো কাণ্ডখানা—গেল তো ঘড়িটা! কত দামী জিনিসটা।' হরিপদ ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

'তাতে তোমার কি? জিনিসটা কি তোমার?' মিতু মায়ের দিকে তাকাল। রাণু নির্বাক। গলার কাছে একটা দলা জমেছে—তাতে কিছু রাগ থাকলেও অসহায়তার চাপে কোণঠাসা হয়ে আছে। চৌরঙ্গী অকৃশান হাউসের ধুলো উড়িয়ে মিলেছিল অমূল্য রতন। ওরা তখন পার্ক স্ট্রীটে উঠে আসছে. ফ্ল্যাটের দখল নেবার দিন স্থির হয়ে আছে আর প্রণবের মতে ফ্ল্যাটটার ভারী জীবন্ত একটা চরিত্র আছে, কতকগুলো নিজস্ব দাবী—সুন্দরী মেয়ে যেমন সজ্জা দাবী করে। মারোয়াড়ির হাত থেকে সেই জন্যেই ছিনিয়ে এনেছিল ঘড়িটা।

'মা—ওমা—দ্যাখো দ্যাখো—ঘড়িটার কিচ্ছু হয়নি। এই তো মোরগটা ঘাড় বার করছে।'

বাঁ হাতে দোচালা কুঁড়েঘরের দরজাটা ফাঁক করে মিতু ডান হাত ঢুকিয়ে ঝুঁটি ধরে মোরগ বাছাধনকে টেনে বার করে এনেছে। প্রণোর ছেলে যে চালচলনেই মালুম হয়। এখন থেকেই ইঞ্জিনীয়ারিঙ শুরু করে দিয়েছে।

বিকেলে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে প্রণব বোঝাচ্ছিল, 'জানো রাণু—পুরোপুরি ওভারলুক করা ছাড়া বোধহয়—মানে একদম নজর দেবে না, যা করে করুক, যেন দেখতেই পাওনি এরকম একটা ব্যাপার করবে। ইন্ ফ্যাক্ট—ওরা আমাদের ইরিটেট করতে চায়, আরো বেশী অ্যাটেন্‌শান্ পেতে চায়। তোমার মনে নেই, সেই যে বইটা এনেছিলাম…'

'এ বি সি অফ চাইল্ডস্ সাইকোলজি।'

'হুঁ, কিন্তু মিতু কোথায় গেল বলতো? এখনো ফিরল না!'

'হরিপদর সঙ্গে ওই মোড়ের দোকানে পাঠিয়েছি। তোমার সিগারেট আনতে যাচ্ছিল।'

'মিতুকে একটু আধটু বাইরে পাঠালে ভালই হবে।'

'সে তো আমিও বুঝি। কিন্তু তুমি যাই বলো, চাকর বাকরদের হাতে ছেলে তুলে দিয়ে হাঁফ ছাড়ার কাল্‌চার আমি জীবনে আয়ত্ত করতে পারব না।'

কথাটায় শব্দমাত্র অতিরঞ্জন নেই। হরিপদকে দাঁড়িপাল্লায় তুললে বিশ্বস্ততার সঙ্গে পঞ্চাশ গ্রামেরও ফারাক হবে না। তবু এ ব্যাপারে রাণুর মতামত তার চীফ ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের মতোই দৃঢ়। চাপ তাপ বা মিনতি—কিছুতেই কাজ হবে না।

জলতরঙ্গের টুঙ-টাঙ ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। মিতু ছাড়া আর কেউ মিতভাষী কলিঙবেলকে এভাবে ব্যস্ত করে না। দরজাটা ল্যাচের শাসনে থেকেও ধড়ফড় করে উঠল দু'হাতের বেজায় ধাক্কা খেয়ে। একটা ফেল্ট প্যাডিং দরকার। এই ফ্ল্যাটে শব্দরা যাতে অভদ্রতা করতে না পারে সেইজন্য মেঝের ওপর কার্পেট, চেয়ার টেবিলের পায়ের নিচে রবারের ঢাকনি আর দরজার মাথায় মাথায় আঁটা আছে সুশিক্ষিত যন্ত্রের কব্জি—দমকা হাওয়া ও বেয়াক্কেলে ধাক্কাকে ঠিক রুখে দেবে শেষ পর্যন্ত। এত সতর্কতার মধ্যেও কিন্তু মিতু শব্দ তৈরি করে। এই শব্দগুলোই ওর প্রতিবাদ, নিঃসঙ্গতার ও ভাল না-লাগার বিরুদ্ধে জেহাদ।

চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাণু দরজা খুলতে গেল।

খোলা দরজা দিয়ে একটা রকেট ছুটে এসে পড়ল বাবার কোলে। কোনক্রমে কাপটা সামলেছে।

'বাপি, আমি রঙ খেলব। রঙ এনে দাও।'

'সে কীরে! রঙ খেলবি কিরে!'

রাণু এক পলক তাকিয়েই ফ্রিজের দরজার হাতলে মন দিল।

'সবাই রঙ খেলছে তো। চল না বাপি, রঙ কিনে দেবে।'

রাণু পুডিঙটা টেবিলে রাখল। ঠাণ্ডা ধোঁয়া বেরচ্ছে। 'ভাখো মিতু—পুডিঙ উইথ্ প্লাম!'

মিতু তাকায়নি। 'বাপি কখন যাবে?'

রাণু হঠাৎ হাসিখুশি হয়ে বলল, 'বাপি! নিউ মার্কেটে যাবি? সেই টেডি বেয়ারটা!'

প্রণব সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল, 'ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ তো! চলো মিতু, আজ টেডি বেয়ারটা নিয়ে আসি।'

'না আমি নিউ মার্কেটে যাব না। নিউ মার্কেটে রঙ পাওয়া যায় না। ওরা দোল খেলেনা। ও বাপি, রঙ কিনব—চলো না—'

রাণু চেয়ার টেনে বসে পড়ে। মিতুর গালে চুমু খেয়ে বলে, 'এ মা! রঙ খেললে মিতুকে যে তখন ভূতের মতো দেখাবে। ইশ্—কি ডার্টি!'

এক ঝটকায় মাথা থেকে মায়ের আদুরে হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বাপির গলা জড়িয়ে ঝুলে পড়ে মিতু, 'নিশ্চয় আমি ভূত হব। হবই হব। রঙ কিনে দিতেই হবে! চলো না বাপি—'

রাণু চেয়ার ছেড়ে পা ঠুকে ঠুকে কিচেনে গিয়ে ঢোকে। ঘরের চার দিক থেকে তার চাপা স্বর হরিপদকে শাসন করে বেড়ায়, 'সত্যি হরিপদ, বুদ্ধিশুদ্ধি তোর কোনকালে হবে না! যত বয়স বাড়ছে তত যেন. কি আক্কেল বলতো তোর—দোকানে ফাগ আবির দেখিয়ে মাথাটা বিগড়ে দিলি তো?'

রাণু ফিরে এসে দেখে মিতু বাবার বুকে অসুর হয়ে বসে কিল মারছে। 'আমি দোল খেলবই, সবাই খেলছে—'

'খেলবে বই কি বাবা! নিশ্চয় খেলবে। দোলের দিন রঙ খেলবে না! কিন্তু সে তো এখনো দেরী আছে। তার জন্য এত কান্নাকাটি করে।'

'তোমারও কি মাথা খারাপ হল নাকি!' রাণু নিজেকে আর সরিয়ে রাখতে পারে না। এখন প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তুলবে আর তারপর যখন—'ওই সব বিশ্রি রঙ মেখে, ভিজে, শেষকালে একটা কাণ্ড হক! ডক্টর সরকার তো সেদিন বলছিলেন, এই সব রঙের মধ্যে নাকি স্কিনের পক্ষে ক্ষতিকর অনেক কেমিক্যাল আছে। তার ওপর চাইল্ডস স্কীন্। ভীষণ ডেলিকেট।'

মায়ের কথার মর্মার্থ অনুধাবন করে মিতুর খেপে উঠতে দেরী হয় না, 'তবে বললে কেন ! বাপি ! ও বাপি ! রঙ কিনে দেবেনা ? বাপি—'

রাণু তবু থামতে চায় না, 'ডোণ্ট গিভ হিম ইন্‌ভালজেন্স ! প্লিজ্—এটা ভবানীপুর নয়। দেখেছ তো কি কাণ্ড হয় হোলির দিন !'

ভ্রূভঙ্গিতে রাণুকে ধৈর্য ধরতে ইশারা করে প্রণব।

বাবার আশ্বাস পেয়ে খুশীতে ফেটে পড়ে মিতু। গলা জড়িয়ে একটা লম্বা চুমু। ঝকঝক করছে চোখ দুটো। কী ব্রাইট ! চোখ দেখলেই একজনের ইন্টালিজেন্স ধরা যায়। এই প্রথম দোল খেলবে মিতু। ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে জন্মদিনের কেককাটার মতো একটা রোমাঞ্চে তার ছোট্ট মনটা একেবারে টইটম্বুর।

মিতু খুব খুশী।

আরো খুশি রাণু।

আর প্রণব গর্বিত দু'জনেরই খুশির ব্যবস্থা করতে পেরে।

মিতু কালকে দোল খেলবে কিন্তু রঙ মাখবেনা। লাল নীল হলদে সবুজ—রকমারি বেলুন এখন বারান্দায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। তাদের টেঁপা পেট জলে ঠাসা। যাই হোক মিতু এখন জানে যে কাল সকাল থেকেই সে দোল খেলবে আর বড় বড বাড়িতে দোল খেলা মানেই বেলুন ছোঁড়া। এখানে সবাই অনেক দূরে দূরে থাকে তো ! দোকানে দোকানে মাটির সরায় পাহাড করা ফাগ আবীর শুধু এক তলার লোকেদের জন্য, যারা ছোট ছোট নিচু নিচু বাড়িতে গাদাগাদি করে আছে, একে অন্যের নাগালের মধ্যে।

দু'দিন ধরে দোলের মহড়া চলছে। বিভিন্ন তলার বারান্দা থেকে যখন তখন বেলুন ছিটকে আসছে। গাড়ির মাথায়, বিশেষ করে লোকের গায়ে বেলুন ফাটলে সেই জলের ঝাপটার মতোই মিতুর হাসি ছলকে পড়ছে। তাও তো বেলুনগুলোয় এখনো শুধু সাদা জল আছে ! জলভরা বেলুন অনেক ছুঁড়েছে মিতু। টিপ করে ছ'তলা নিচে একজনের মাথায় ফেলা সহজ কর্ম নয়।

প্রণব মিতুকে বেলুন ছোঁড়ার টেকনিক শেখাতে শেখাতেই রাণুকে বলছিল, 'বুঝতে পারছ, এরিয়াল বোম্বিঙ করা কত কঠিন ? এরিয়াল বোম্বিঙের সময় প্লেনটা মুভ্ করে আর এখানে মুভ্ করছে টার্গেটটা।'

মিতু সারাদিনই বারান্দায়। স্কুলেও যায়নি। হরিপদ বেলুন ফুলিয়ে জল

ভরে দিচ্ছে। মিতুর জেদী হয়ে ওঠার কারণটা এখন স্পষ্ট। কিছুই তো করার নেই বেচারীর সারাদিন।

ছুটে ঘরে এসে ঢুকল মিতু।

'কিরে ! মারতে পেরেছিস ?'

কোন উত্তর নেই। কারুর গায়ে বেলুন পড়লেই যে মুখ লুকিয়ে ছুটে ঘরে এসে ঢুকতে হয়, সেটাও শিখে ফেলেছে মিতু।

সব আয়োজন এখন ব্যর্থ হবার উপক্রম। যার কথা কেউই খেয়াল করেনি সে আজ দোলের দিন ভোর না হতেই বেয়াড়া রসিকতা জুড়েছে। বাড়ির জঙ্গলের ফাঁকে আকাশের নীল ফালিগুলোয় ক্রমেই আরো বেশী করে কালো রঙ এসে মিশছে। আকাশটা যেন জলের ভারে প্রতি মুহূর্তে আরো ঝুলে পড়ছে। সকাল সাতটা থেকে মিতু বারান্দায়। কিন্তু তিন চাকা গাড়ির দুধওলাকে বাদ দিলে দ্বিতীয় কোন প্রাণী দেখা দেয়নি। হরিপদ অবশ্য এসেছে কিন্তু তখন তো রাত পোয়ায়নি। মিতু তাই একবার মাত্র সুযোগ পেয়েছে চিৎকার করার। কিন্তু দুধওলাকে ভেদ করতে পারেনি। অবশ্য দুধের গাড়ির টিনের বাক্সয় বেলুন পড়ে বাজনা বেজেছে বার কয়েক। বহু রঙের বিস্ফোরণ বিভিন্ন ধারায় গড়িয়ে পড়েছে।

শাসানি দিয়ে রাগ মিটলনা। বৃষ্টির অজস্র প্রহরে শুরু হল যখন কলকাতা ক-য়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত সেই থেমেছে। বৃষ্টিধারার ছড়ের টান্ পড়তেই মিতু সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে উঠল। মানুষ জনের আনাগোনা সুরু হবার মুখে এই বিপর্যয়। বাড়ির দারোয়ানরা এমনিতে নিচে ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু তারা আজ সকাল থেকে গাড়িবারান্দার আড়াল নিয়েছে। রঙ ভীরু মানুষরা তো বাড়ির বাইরে পা-ই রাখবেনা, তার ওপর এই বৃষ্টি। বাজার করার কাজটাও লোকে এবার মুলতবী রাখল।

মিতু কাঁদছে। অসহায় ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁদছে। মাঝে মাঝে দম আটকে শরীরটা ডোঙা হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে যাবে বলেও তাকে সান্ত্বনা দেওয়া যাচ্ছেনা। মিতুর বয়সে রঙীন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কেউ নিজের জন্য আশ্বাস সংগ্রহ করতে পারেনা। রাণু ও প্রণব ত্রস্ত, নিজেদের মধ্যে চোরা চাউনি আদান-প্রদান করছে। এখন একটা বেফাঁস কথা মিতুকে বিস্ফোরণের

মুখে ঠেলে দিতে পারে এরকম একটা বোধ। মিতুর কান্নার স্বর চড়তে চড়তে ধারাপাতের শব্দকে চাপা দিয়েছে।

কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটা নীল হয়ে গেল। বাবা ক্লাউন সাজল, মা ক্লাউনের গাল লাল করে দিল সিঁদুর মাখিয়ে। মিতুর গলা চিরে কান্নাগুলো এখন ভোঁতা গোঙানিতে পরিণত হয়েছে।

'ছেলেটা যে কেঁদে কেঁদে··' রাণু সাইকিয়াট্রিস্টকে ফোন করতে ছুটল। 'শরীর বলে কথা, লাঙস ড্যামেজ হওয়া, কি ভোকাল কর্ড চিরদিনের মতো······'

দুটো নম্বরকে পাক লাগাবার অবসরে বৃষ্টির উচ্চারণ যেন হঠাৎ এক পর্দা লাফ মেরে কানে এসে বাজল। রাণু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। মিতুর কান্না বন্ধ, প্রণবের মুখে অনাবিল হাসি।

'বুঝলে—মিতু আজ হরিদার সঙ্গে দোল খেলবে আর আমি ওকে বেলুন সাপ্লাই করব—কি রকম আইডিয়া বলো?'

মিতু তার তুলোর মত নরম হাতে দু'চোখের জল মোছে। রাণু ন্যাপকিন নিয়ে আসে মুখটা পরিষ্কার করে দিতে।

প্রণব বলে, 'কি আর করা যাবে, হরিপদকেই নিচে পাঠাই, কি বলো—'

'সেই ভাল।' রাণু হরিপদকে কাছে ডাকে, 'কিরে, শুনলি তো, দাঁড়িয়ে কেন? দেখছিস তো কি বায়না ধরেছে। ছেলেমানুষ—যা একবার। কতক্ষণ আর, একটু পরেই অন্যদিকে মন যাবে।'

না-হ্যাঁ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে পারে না হরিপদ। চিন্তা করতে তার কিছু সময় লাগে আর তার মধ্যেই সিদ্ধান্ত যা কিছু নেবার নেওয়া হয়ে যায়। হরিপদর মন্থরতা থেকে কিছু অস্পষ্ট দ্বিধা ব্যক্ত হয়।

'কি হল রে?'

হরিপদ বোকার মতো হেসে জামা-কাপড়ের ওপর তার দৃষ্টি নামিয়ে রাখল। দারিদ্র্য হরিপদকে বেশ ভাল মানায়। তার গায়ের চামড়া, চলনের ঢিলেঢালা ভাব আর ঘোলাটে দৃষ্টি বয়সের বিচারে স্বাভাবিক না হলেও বেমানান নয়। তার সঙ্গে ছেঁড়া ফাটা রিপু করা জামা কারুর দৃষ্টিকে কোনো প্রশ্ন করে না।

হরিপদর সমস্যাটা ধরা পড়ল রাণুর কাছে। জামাকাপড়ে রঙ লাগাবে বলে ইতস্তত করছে। ভিজে জামাকাপড়ের সমস্যা। এত নিড়বিড়ে লোক

দেখা যায় না। আড়াই জনের সংসারে কাজ করতেই হিমসিম। রাত সাড়ে ন'টার আগে কোনদিন বেরোতে পারে না।

'বুঝেছি। জামাকাপড় তো? তার জন্যে চিন্তা নেই। দাদাবাবুর কাচা জামাকাপড় বার করে রাখব। তোকে দেব বলে আলাদা করেই রেখেছিলাম।' রাণু কোমল হয়ে পড়ে।

আর বলতে হয় না, হরিপদ অনেকখানি ঘাড় কাত করে বেরিয়ে গেল। এই জন্যেই হরিপদ সবার কাছে দাদাবাবু দিদিমণির প্রশংসা করে। সব দিকে দৃষ্টি আছে ওদের। এমন মনিব পাওয়া ভাগ্যের কথা।

মিতু বারান্দায় চলে এসেছে। দু'হাতে দু'টো বেলুন নিয়ে দাঁড়িয়ে। 'হরিদা নিশ্চয় সিঁড়ি দিয়ে নামছে। না হলে এত দেরী হয়!'

হরিপদ দেখা দিতেই মিতুর প্রথম বেলুনটা তার পায়ের কাছে ফাটল। 'ইশ্—একটুর জন্যে—'

হরিপদ হাসিমুখে ওপরদিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল।

'মারতে পারে না—' হরিপদ স্বর কেটে চেঁচিয়ে উঠল।

মিতুর দ্বিতীয় বেলুন ছুটল, হরিপদ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঊর্ধবাহু হয়ে যেন ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণ ঠেকাচ্ছে। মিতুর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম…পরপর বেলুন ছুটতে লাগল আর মিতুর গোনাগুন্তি বেলুনরা যেন হঠাৎ মন্ত্রবলে অগুন্তি অসংখ্য হয়ে হরিপদকে নাজেহাল করে দিল। হরিপদ জানত না কাল বেশ কিছু ট্যাক্সির টিনের চাল বেলুনের আঘাতে তুবড়ে বসে গেছে, বা জানলেও সে নিশ্চয় তার মাথার খুলির সঙ্গে টিনের চালের ক্ষমতার তুলনামূলক বিচার করতে পারত না। মিতুর বাবাও জানত না যে পনেরো তলা আকাশচুম্বীর গ্রাউণ্ড ফ্লোর বাদ দিলে, বাকী চোদ্দ তলার প্রত্যেক তলায় চারটি করে সংসারের বারান্দায় বারান্দায় মিতুরা ক্ষুধার্ত উদগ্রীব হয়ে বসেছিল।

হরিপদ লুটিয়ে পড়ল।

মিতু খিলখিল করে হাসে। হরিদা যা মজা করতে পারে। মিতু রেগে কিলচড় মারলেই দমাস করে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে, মুখ হাঁ করে চোখ বুজিয়ে মরার ভান করে।

মিতু হাসতে হাসতে বেলুন ছুঁড়ে চলে, মিতুরা সবাই বেলুন ছুঁড়ে চলে আর হরিপদ মরার ভান করে পড়ে থাকে।

আধুনিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরী লাল রঙের সঙ্গে হরিপদর রক্ত এমন

মিশতে শুরু করে যে দশ পা দূরে দাঁড়িয়েও দারোয়ানরা তিন চার দম্, হেসে নেবার ফুরসত পায়। তারপর তাদের হাসি মিলোনো, ছুটে আসা ও' গা ছমছমে 'হায় রাম' খেদোক্তি সময় বিচারে একাকার হয়ে যায়।

মিতুদের বাবা-মা'রা ছেলেমেয়েদের ঘরে ঢুকিয়ে নেয়। বারান্দায় দরজা পড়ে যায়। আঘাত রক্তপাত দুর্ঘটনা কোমল শিশু মনে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে।

> উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে আপতিত বস্তুর আঘাত-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
> ধরা যাক, জলভরা বেলুনের ওজন = ১৫ গ্রাম
> বহুতল বাড়ির প্রতি তলের উচ্চতা = ৩ মিটার
> অতএব, পতিত বস্তুর আঘাত হরিপদর পক্ষে মারাত্মক হয়েছে বলে যদি জানা যায় তবে আততায়ী বেলুনটি অবশ্যই ন্যূনপক্ষে দশ তলা থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

সেদিন রাত্রে মিতু ঘুমিয়ে পড়ার পর রাণুকে পদার্থ-বিদ্যার উপরোক্ত পাঠটি হৃদয়ঙ্গম করানোর পর প্রণব শুয়েছিল। নিশ্চয় দশ বা তদূর্ধ কোনো তলের বেলুনের আঘাতেই হরিপদ, হয়তো বা…

# চরিত্র



নাইট শো। ইংরেজি বই হলে ভদ্রজনোচিত এগারোটার আগেই ভেঙে যায়।

রাস্তার আলো-অন্ধকারে কাঁপন ধরায় রিক্সায় চাকার বৃত্ত আর কাঠের স্পোকেরা। গতিবান হবার সদিচ্ছা ঠনঠন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে দুর্বলরাও ট্যাক্সি ও প্রাইভেটদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে গিয়ে তাদের পঙ্গু করে রাখে সাময়িক। প্রথম অধিকার পদযাত্রীর, তারপরেই ওদের। অযান্ত্রিক বলেই রিক্সার গতিবিধিতে কিছু আচমকা বিশৃঙ্খলার প্রবণতা আছে, যার আগাম হদিশ পাওয়া যায় না।

সরকার সাহেবের ট্যাক্সি ডাকতে দেরি করে ফেলার প্রধান কারণ এইটেই। ডাণ্ডা চাকা আর ঘন্টির উৎপাত একটু কমার পর তিনি ফুটপাতের আশ্রয় ত্যাগ করলেন।

ট্যাক্সিটা সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে দেখে তিনি ডান হাত তুলে 'এই যে আছি'—জানালেন।

সরকার সাহেবকে নজরে রেখে মিসেস পোর্টিকোর তলায় গায়ে আলো মেখে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার তিনি সরকারের পাশে চলে এলেন।

ট্যাক্সি ড্রাইভার ব্রেকে পা না রেখেই একটা চলতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'জাইয়েগা কাঁহা?' উত্তরের অপেক্ষা করেই গাড়িটা হাঁটি-হাঁটি-পা-পা গতি বজায় রেখে অগ্রসর হচ্ছে দেখে রিফ্লেক্স অ্যাক্‌শান সরকারকে ট্যাক্সির পশ্চাদ্ধাবনে প্ররোচিত করল। মিসেস সরকার বিচলিত না হয়েই সরব হলেন, 'পার্ক স্ট্রীট—পার্ক স্ট্রীট—'

কণ্ঠস্বর মহিলার, ফলে নিবেদনে একটি বাড়তি মাত্রা সংযোজিত হ'ল, কিন্তু তবু ট্যাক্সির গতির কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি ধরা পড়ল না। এই রকম গতি বিভ্রান্তিকর, কারণ যে কোন মুহূর্তে রুদ্ধ হবার সম্ভাবনাটাকে বাতিল করে দেওয়া যায় না। অন্তত পাঁচ সাত পা ছোটার আগে তো নয়ই। ট্যাক্সি ধরতে না পারার চেয়ে এই থামি-থামি ছলনায় সরকার রীতিমতো উত্তেজিত।

—'ইডিয়ট। শালাদের চাব্‌কে ঢিট করা উচিত। খেয়ালখুশি মতো প্যাসেঞ্জার তুলবে!'

ঝকমকে জীবনকে যারা যথেচ্ছ মুঠো মুঠো পেতে অভ্যস্ত তারা কখনো ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে না। সরকার নৈতিক শাসনের পর মিসেসের পাশে এসে দাঁড়িয়ে ব্যর্থতার আরো একটি কারণ নির্দেশ করলেন, 'তুমি আগে থেকে পার্ক স্ট্রীট বলতে গেলে কেন! এখন যে যার গ্যারেজের দিকে ফেরবার জন্যে বেছে বেছে প্যাসেঞ্জার ধরছে।'

'তুমিও তো আগে দরজাটা খুলে ট্যাক্সিটাকে আটকাতে পারতে। এমনিতেই চলে যাচ্ছিল দেখে বললাম, যদি ওদিককার গাড়ি হয়।'

আরেকটা ট্যাক্সির আগমন না ঘটলে মিসেসের যুক্তিকে খণ্ডন করে একটা উত্তর নিশ্চয় ঝলসে উঠত। সরকার এবার দ্বিধা ত্যাগ করে সোজা হাত হাত চালালেন ট্যাক্সির হাতলে। বোতামটাকে চাপ দিয়েও কিন্তু দরজা খোলার কটাস্ শব্দ শোনা গেল না। ভেতর থেকে লক করা, উপরন্তু ট্যাক্সিটা ঘোঁৎ করে একটা লাফ মেরে ছুট জুড়ে দিল। যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে যে ট্রেন ফেল হয়ে যাবে। কলকাতার এক্সপার্ট ড্রাইভারদের পাইলট বলা হয়, অর্থাৎ তারা মনস্তত্ত্ব বিশারদ ড্রাইভার। তারা জানে অস্তিত্ব বিপন্ন হবার মতো সংকট সৃষ্টি করতে না পারলে পথচারীরা পথ ছেড়ে দেয় না। যাত্রী হবার আগ্রহ নিবারণ করারও এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরকার দেখলেন আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি তাঁর হাতের মুঠোকে যথাসময়ে ঢিলে করে দিল এবং ট্যাক্সি পালাল। শুধু তাই নয়, পলাতক চাকা বেলপাতা হয়ে কাদাজলের

অশান্তি ছিটিয়ে মনে করিয়ে দিল, স্থান কলকাতা, কর্পোরেশনের তদারকিতে আছে, আর কাল—বর্ষা।

ভিজে জিনিস জলেনা, ব্যতিক্রম শুধু সন্থ কাদার ছিটে-লাগা বেনারসী পরিহিতার চোখ দুটো।

'আই টোল্ড ইউ—গাড়ি ছাড়া আসা ঠিক হবে না. ফিরতে···'

মিসেস গালে রুমালের খুপি ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে কাতর হলেন, 'ঈশ—নোঙরা জলগুলো একেবারে মুখে—তোমার যদি কোন সেন্স হয় কোনদিন!'

ক্রোধটা বেনারসী জাত হলেও স্বাস্থ্যহানিকে তিনি মুখ্য করে তুললেন:

'তোমায় কে রাস্তায় নামতে বলেছিল! ট্যাক্সি ডাকছি তো আমি।'

'ট্যাক্সি ডাকছি' ঘোষণার পর সরকার সাহেব স্বয়ং নিজের কথার ধাক্কায় ঝটপট আরো দু' পা এগিয়ে গেলেন, প্রায় মাঝরাস্তায়, কিন্তু ডাকবেন কাকে? ট্যাক্সি আর নেই।

'এখন বোঝো'—আবার ফুটপাত থেকে মিহি স্বর হুল ফোটায়। 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে তো আর লাভ নেই। তোমায় বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে মাঝরাতে ট্যাক্সি আসবে না।'

'ডোণ্ট টক্ রট্। লাস্ট উইকে কটা গাড়ি রাস্তা থেকে লিফট হয়েছে সে খবর রাখো? অত অধৈর্য হলে···'

'বাট ইট ওয়াজ নোন টু ইউ। আমি বলিনি, আজ নাইট শোয়ের টিকিট কেটে রেখেছি। ড্রাইভারটাকে ছাড়লে কেন?'

সরকারের উত্তরের বদলে ঠন-ঠন ঘন্টি ডাক দিল। রিক্সাওয়ালা খরিদ্দার বাজাচ্ছে।

'আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ আছে কোন!' বাঁ হাতের মুঠোয় শাড়ির গুচ্ছ পুরে হিল ঠুকে এগিয়ে এলেন মিসেস, 'একে এই ন্যাষ্টি ওয়েদার—তার ওপর রিক্সা—গড্—'

'পার্ক স্ট্রীট কিতনা?' প্রশ্ন ছুঁড়ে প্রফেশনাল হবার চেষ্টা করলেন সরকার। যেন হামেশাই রিক্সায় চলাফেরা করে থাকেন।

'পারকিস্ ষ্টিরিট? চলিয়ে।'

'কত নেবে বলো!' দর না করে ওঠা রিস্কি।

'পারকিস্ ষ্টিরিটমে কাঁহা জাইয়েগা?'

'এই সামনের ট্রাম লাইন দিয়ে সোজা···'

সরকারকে থামিয়ে মিসেস বলে ওঠেন, 'ক্যামাক্ ষ্ট্রিট—ক্যামাক ষ্ট্রিট মালুম হ্যায় ?'

রিক্সাওলা ঘন্টি দিয়ে হাতের ঘামাচি চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'হাঁ হাঁ —লাল বাত্তি মোড়—'

'লাল বাত্তি ! কি বলে কি ? ক্যামাক ষ্ট্রিটও জানে না। আশ্চর্য !' সরকার ধৈর্য রাখতে পারেন না।

মিসেস সমস্যা আসান করে দেন, 'ওইটাই হবে আর কি।'

'কিত্না ভাড়া ? বোলো !' সরকার ভাড়া ঠিক না করে চড়তে রাজী নন। সুযোগ পেলেই ব্যাটারা মাথায় চড়ে বসে। তখন সে একটা সীন্।

'দো রুপেয়া সাহাব।' রিক্সাওলা রিক্সা নামিয়ে হাতলের বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়াল।

সরকার এক পা পিছিয়ে এলেন। ভাড়া হেঁকেই রিক্সাওয়ালাটা এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন এই ভাড়াতে সোয়ারী আর আপত্তি করবে না। উঠবেই। উঠেই থাকে।

অত সোজা নয়।

'রুপিয়া মাগ্না হয়ে গেছে না ? এইটুকু রাস্তা—'

'কেয়া বোল্তা সাহাব ? আপ্কা মাফিক আমির আদমী—'

'এর মধ্যে আবার আমিরের কি আছে ! যা খুশি তাই বললে তো আর হবে না।' সত্যিকার ভাড়াটা জানেন না বলেই সরকারের দ্বিধা আরো বেশি। ঠকে যাওয়াকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না। 'এক টাকায় যাবে তো চলো – ' সরকার নির্মম ও সংক্ষিপ্ত হবার চেষ্টা করেন।

'কেয়া ?···' ও তারপর আরো কয়েকটা ক্রম অস্পষ্ট শব্দ বার করেই রিক্সাওয়ালা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সচল হবার কার্যক্রমের প্রথম পর্বে নিচু হল।

'দেড় টাকায় যাবে ?' তাকে দাঁড় করাতে মিসেস কণ্ঠক্ষেপে বাধ্য হলেন। সিনেমা হলের পোর্টিকের আলোগুলো বিদায় নেবার সময় তাদের একতা জাহির করতেই গায়ের ওপর অন্ধকারের শীতল ঢেউ আছড়ে পড়েছে। তাছাড়া মিসেসের দৃষ্টি কোন বিকল্প যান আবিষ্কার করতে পারেনি।

'চলিয়ে !' একটা অনিচ্ছা আবার যাত্রী তোলার জন্যে নিচু হয়ে রিক্সা নামিয়ে রাখল।

'সাবধানে উঠো—' মিসেসকে সতর্ক করে দিলেন সরকার।

মিসেস পা-দানে বাঁ পা রেখে হাতের আকর্ষণে নিজেকে উত্থিত করলেন, দু'তিনবার বেসামাল পা ঠোকাঠুকি করে শরীরটাকে নব্বই ডিগ্রি পাক খাইয়ে সীটের দশ ইঞ্চি ওপর থেকে নিজেকে মাধ্যাকর্ষণের হাতে সমর্পণ করলেন। রিক্সার লম্বা হাতলদুটো ধনুকের ছিলার মতো দু'তিনবার থির্‌থির্ করে চোট সামাল দিলে সরকার পা তুললেন। স্মার্টলি। কথাটা তাঁর নিজেরই মনে হল। এখনো ফিট্—

রিক্সাওয়ালা তাঁদের আনুভূমিক অধিষ্ঠানে এনে পিঠ ঠেস দিয়ে বসার সুযোগ করে দিলে সরকার বললেন, 'এক টাকাতেই রাজী হত। ওটাই বোধহয় ঠিক ভাড়া।'

কোমরের ওপরের অংশ সামনে ঝুঁকিয়ে রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালু করার প্রথম বাড়তি প্রয়াসটুকু মিটিয়ে স্বাভাবিক গতিছন্দে সবে কয়েক কদম এগিয়েছে, মেমসাহেব হেঁকে উঠলেন, 'এই রোকো—রোকো—'

থতমত লাগল। পায়ের পাতাকে খোয়াওঠা ভিজে রাস্তার ওপর চেপে ধরল। শরীরের পেশীগুলোর সঙ্গে গতির শক্তিপরীক্ষা।

'এই ভিজে ন্যাকড়াটাকে সরাও দেখি—'

আরোহীকে রক্ষা করার জন্য বর্ষার দিনে এই পরদাটা বাড়তি সংযোজন। এখন সেটা গুটিয়ে ছাতের ওপর তোলা আছে কিন্তু কয়েকটা বেচাল ভিজে রশি আর রোঁয়া-ওঠা কানা লটরপটর করছে বিপজ্জনক ভাবে মুখের কাছে। রিক্সা চালু হবার আগে বোঝার উপায় ছিল না।

'রহনে দিজিয়ে মেমসাহাব। ফির বারিষ—'

'নেহি—নেহি—যা বলছি করো।'

কাজেই নাচার। হাত লাগাতেই হয়। ডান দিকের গেরো খুলে তারপর বাঁদিকে—ভিজে পরদাটা নামিয়ে দলা পাকিয়ে পা-দানে রাখতেই আবার মেমসাহেবের গোঁসা, 'ইস্—ভিজে জব-জব করছে—সব ভিজল আজ—'

রিক্সাওলা কান দেয় না। পরদাটা কি সে পিঠে করে নিয়ে যাবে নাকি! যাত্রা শুরু হল। পরদার সিক্ততা আর মেমসাহেবের পায়ের মধ্যে অপরিবাহী চটি থাকা সত্ত্বেও তিনি সহজ হতে পারেন না।

ফাঁকা রাস্তা। শেষ সোয়ারীকে নামিয়ে দিয়ে ঘরে ফেরার তাড়া বাহকের দুই পদক্ষেপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে যথাসম্ভব প্রসারিত করে দেয়। ঘন্টির তাল বিভাগেও তার মালুম পাওয়া যায়। কাঠের হাতলের

পায়ে নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে পেতলের ঘন্টির একটি ক'রে আঘাত গতিছন্দের মাপ।

রাস্তার একটা জায়গাকে কুপিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় উন্নতি কল্পেই। জমা জলের নীচে গর্তের গভীরতা ঘাপটি মেরে আছে। রিক্সার চাকাকে তাই ট্রাম লাইনের শিরা পার হতে ঝাঁকানি খেতে হয়।

সরকার সাহেবের মাথা ঠুকে যায়, স্বর সপ্তমে আঁতকে ওঠেন মেমসাহেব। 'এই—এই—কেয়া দিল্লাগী হোতা হ্যায় আস্তে চলো বলছি—'

রাগের পরিমাণটা হিন্দীতে বার্তাবহনের চেষ্টা থেকেই ধরা পড়ে। রিক্সাওলা ততক্ষণে ট্রাম লাইনের শাসন ত্যাগ করে আবার স্বাধীনতার স্বাদ নিচ্ছে।

সরকার বলেন, 'সব ব্যাটা সমান। যেমন রিক্সা তেমনি ট্যাক্সি—একবার প্যাসেঞ্জার উঠলে হয়, তারপর তাকে নামাতে না পারা অবধি—তবে না নেক্সট্ প্যাসেঞ্জার—'

সব কথা কানে যায় না, রিক্সাওলা বঙ্গভাষী নয়. তবু মর্ম অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। সে আরো গতি অর্জনে মন দেয়।

'দ্যাখো দ্যাখো—উজবুকটা আরো জোর ছুটছে। ভিজে রাস্তায় একবার পা স্লিপ করলে—'

'মাই গড্! ওকে বারণ করো!'

রিক্সাওলার ত্যাঁদড়ামি দাম্পত্য সম্পর্ককে সুন্দর করে মেরামত করে দিল। বিপন্ন সময়ের দান একতা।

'কেয়া বোলা শুনতা নেহি? আস্তে চালাও।' আদেশ অমান্য করার মতো দুঃসাহসকে নিধন করতে গলার স্বর কঠিন ও উচ্চ হয়ে ভদ্রতাকে বর্জন করে।

একটা গালি জিভের ডগায় নিশপিশ করে উঠেছিল। সেটাকে দাঁতে কেটে ছিঁড়ে ফেলার জন্য রিক্সাওলাকে রীতিমতো মেহনত করতে হয়। সে গতি কমায় আর গতি কমাবার পরম অনিচ্ছা ব্যক্ত করে গতি কমাবার অতি ধীর প্রক্রিয়ায়।

সরকার আবার বেশী ভাড়া নেবার কথা স্মরণ করেন, 'ঠিক ভাড়াটা জানি না তো—আর এ ব্যাটারা ঠিক বুঝেও ফেলে, জানে রিক্সা চড়ে না—'

মিসেসের সমর্থন না পেয়ে তিনি আরো উৎসাহিত হন, 'লোকের সব ভুল

ধারণা। বলে গরীব—কে গরীব? রিক্সাওলারা? হুঁ! খোঁজ নিয়ে দ্যাখো। মুলুকে বছর বছর কত টাকা মানি অর্ডার যাচ্ছে। এখানে থাকে ছাতু খেয়ে আর দেশে কেনা হয় জমি—বুঝলে?'

'তা ঠিক। তবে বাঙালী ছেলেদেরও বলি—ওদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত।'

রিক্সাওলা হঠাৎ ফুটপাতের কিনারা চেপে রিক্সা নামিয়ে দু' পা সরে দাঁড়াল। গামছা দিয়ে ঘাম মুছছে। সোয়ারীদের নামবার সময় দিয়ে নিজে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে। এর পরেই হাত বাড়াতে হবে ভাড়া নেবার জন্য।

'কি হল? এখানে নামালে?' সোয়ারীদের নামার লক্ষণ দেখা গেল না।

'এহি তো লাল বাত্তি মোড়।'

'বললাম না, ক্যামাক স্ট্রীট। এটা কি ক্যামাক স্ট্রীট নাকি?'

রিক্সাওলাকে গতিশীল হতে হল। এবার সে রীতিমতো প্রতিবাদে মুখর, 'বোলা লালবাত্তি মোড়—আউর আভি—'

'একবারো বলিনি লাল বাত্তি মোড়। বলা হয়েছে ক্যামাক স্ট্রীট।' এসব টেকনিক সরকার সাহেবের অজানা নয়। রাগ দেখানো তো আসলে বেশী ভাড়া হাঁকবার ফন্দি।

ক্যামাক স্ট্রীটের মোড়ে পৌছে রিক্সা থেকে নেমে মেমসাব বললেন, 'এই যে—ভাল করে দেখে রাখো, এইটে ক্যামাক স্ট্রীট। কলকাতায় রিক্সা চালাচ্ছ আর ক্যামাক স্ট্রীট···'

সরকার পকেট থেকে মানিব্যাগ টেনে এক টাকার নোটটা বাড়িয়ে দিয়ে খুচরোর পকেটে আঙুল চালালেন। দু' আঙুলে কয়েকটা পয়সা তুলে আট আনিটা হস্তান্তরিত করার সময়, আরেকটা আটানি তাঁর আঙুলকে ফাঁকি দিয়ে প্যাণ্টের পা আর চামড়ার জুতো ছুঁয়ে শব্দহীন হয়ে রাস্তার গিয়ে পড়ল। রিক্সাওলা সেটা লক্ষ্য করল এবং দেড় টাকা ভাড়া বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করে নিল। সাহেব মেম পিছন ফিরতেই পয়সাটা কুড়োতে নিচু হল। সাহেব দেখতে পায়নি। রিক্সাওলার মুখে অদ্ভুত এক হাসি ফোটে। একেই বলে ভগবানের দান—দেবতার বিচার—গরীব মানুষকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার, হয়রানি করার এই ফল।

পয়সাটা কুড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পেছন থেকে হাঁক শোনা গেল, 'বাবু—বাবু সাব—আপকা রুপাইয়া ইধার—'

রিক্সাওলা চমকে পিছন ফিরল। আরেকজন রিক্সাওলা, দেশোয়ালি ভাই। 'বাবুকা পয়সা ওয়াপস দে দো—যো গির গিয়া—'

অন্তরাত্মা জলে ওঠে অযাচিত উপদেশে। এ তার হকের পাওনা। দেবতার দান। ও এসব কথা বলার কে! আসলে হিংসা—কিন্তু ও তো আসল ব্যাপারটা জানে না। লাল বাত্তি মোড় বলে নিয়ে এসেছে···

'কেয়া রে! পয়সা ওয়াপস দো! হামলোগ চিটিংবাজ নেহি! হারামকা প্যায়সা লেকে—বাবু সাব!'

সরকার পিছন ফিরে তাকালেন।

দুই রিক্সাওলা পরস্পরের জলন্ত দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়ে নিশ্চল।

সরকার ঘাড় নেড়ে হাত দিয়ে যেন বাতাসের ধুলো ঝেড়ে ফেললেন, যার মানে, যানে দো—নোঙরা জলের মধ্যে পড়ে গেছে—তখনই দেখেছিলাম—

সাহেব মেমসাহেবকে হাত ধরে রাস্তা পার করে নিয়ে গেলেন।

মেঘ ছেঁড়া চাঁদের আলোর ছিটে লেগেও আটানিটা চকচক করে উঠল না। বোধহয় লজ্জায় গা ঢাকা দিতে চাইছে কাদার মধ্যে। তাকে কেন্দ্র ক'রে এমন একটা জমাট নাটক অভিনীত হল, কিন্তু মুখ্য চরিত্র হয়েও খল নায়কের ভূমিকাটা ওর নিশ্চয় মনঃপূত হয়নি।

# এক অলৌকিক ব্যর্থতা



এমন কোনদিন ঘটেনি। ভবিষ্যতে কোন দিন ঘটবে এমন আশাও নেই। এমন কি সে আশা পোষণ করার মতো উপযুক্ত অবস্থানে হাজির হবার মতলবে যুক্তির পাথেয়টুকু সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য। তবে, এরকম কিছু ঘটলে বড় ভাল হত, আর এই 'হলে ভাল হত'-কে নিয়েই ফেনিয়ে ফুলিয়ে একটা গল্প দাঁড় করানো যেতে পারে।

এক যে ছিল পুলিশ।

এই বলেই গল্প শুরু হক তাহলে। কেউ যাতে বলতে না পারে আজগুবী কল্পনাকে সত্য বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

এক ছিল পুলিশ। নাম তার রমেশ সরকার। কলকাতার বাঙালী পুলিশের এক অতি সুলভ সংস্করণ। রমেশ চাকরি করছে তো করছেই। তাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, এর আগে তুমি কি করতে? সে বলে, পুলিশে চাকরি করতাম।—না না, বলছি, তার আগে কি কিছু করতে? রমেশ সহজে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না। কারণ, যতই সে পিছনের দিকে দৃষ্টি চালায় সব সময়েই দেখে, আয়নায় রমেশের গাঁট্টাগোট্টা প্রতিবিম্বটির কোমরটাকে জড়িয়ে ধরেছে একটা কালো বেল্ট, পায়ে রয়েছে এক জোড়া

ধুম্বো জুতো আর বুকে ও কাঁধে যথাক্রমে নম্বরওয়ালা ও নম্বরহীন সি. পি. তক্‌মা। এমন দিনের কথা রমেশের মনেই পড়ে না যেদিন সে পুলিশ ভিন্ন অন্য কিছু ছিল। মোদ্দা কথা রমেশ পুরনো জমানার পুলিশ। 'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশো বারো'—এই সব ছড়া কাটতে কাটতে তখন কলেজের ছেলেরা বীরত্ব দেখাত। সেকালের ছেলেছোকরারা অনেক সভ্য ছিল, এমন মারকুটে বেয়াদপ হয়ে ওঠেনি।

রমেশের মাইনে একশো বারোয় দাঁড়িয়ে নেই কিন্তু অবস্থাটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এক পোস্টে নাগাড়ে এত বছরের সার্ভিস, রেকর্ড পরীক্ষা করার লোক থাকলে হয়তো দেখা যেত বিরল কৃতিত্ব। তা বলে কোন পরিবর্তনই কি আর রমেশকে স্পর্শ করেনি! রমেশকে জিজ্ঞেস করলেই সে তো রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কিছু দিন যাবত তাকে অনেক ওজন বয়ে বেড়াতে হচ্ছে রাস্তায় রাস্তায়। তার আপত্তিটা অবশ্য শুধু ওজনের কারণে নয়। চেন্ ও বক্‌লশ্ কোমরে বেঁধে রাখাটা কি কোনো কাজের কথা হল? কিন্তু সে কথা বোঝাবে কাকে? এতো আর গোরাদের আমল নয়। রিভলবার বন্দুক যার কাছ থেকে ছেন্‌তাই হতে পারে, চেন্ দিয়ে কোমরে বেঁধে রাখলে শেষপর্যন্ত জ্যান্ত মানুষটা শুদ্ধু ছেনতাই হয়ে যাবে না এমন কোন গ্যারাণ্টি আছে?

চেন বক্‌লশের হাস্যকর ব্যাপারটা নিয়ে রমেশ রীতিমতো ফলাও করে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল। সুযোগ পেলেই ক্ষোভ প্রকাশ করত, 'আমাদের একেবারে কুকুর জন্তু বানিয়ে দিলে, অ্যাঃ!' আসলে রমেশের মনটা একটা চক্রব্যূহ। সহজে কোন ধারণা সেখানে ঢোকেনা কিন্তু যদি ঢুকে পড়ে তাহলে আর তার নিষ্কৃতি নেই। কত দিনে রমেশের রাগ পড়ত আন্দাজ করা কঠিন। হয়তো তার রিভলবারের ওপর নেক্‌নজর পড়লে হৃদয়ঙ্গম করতে পারত যে চেন বাঁধার ব্যবস্থাটা সত্যিই কার্যকর। কিন্তু তেমন কিছু না ঘটলেও রমেশের ক্ষোভটা হঠাৎই একদিন উড়ে গেল।

রমেশের কাছে ঘটনাটা সত্যিই বিস্ময়কর। অভাবনীয়ই বলা চলে। বড় সাহেবের ঘরে তলব পড়েছে শুনে ভুরুটা তার কুঁচকে গেল। 'নিশ্চয় কোন শালা লাগিয়েছে।' এইটাই তার প্রথম চিন্তা। 'চেন্ বক্‌লেশের কথা নিয়ে ঠাট্টা করেছি যে—'

না, ভয় পায়নি রমেশ। কেনই বা পাবে। কি করবে বড় সাহেব?

কিছু বলবে, সতর্ক করে দেবে, ধমকাবে, চার্জশীট্—বড়জোর চাকরিটা নিয়ে টানাটানি। তাতেও খুব ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। এমনিতেই চাকরিটা নিয়ে টানাটানি জুড়ে দিয়েছে তার বয়স, বড় জোর তার চাকরির পরমায়ু আর দু' বছর।

এই সব সাত-সতের ভাবতে ভাবতেই রমেশ স্যালুটটা ঠুকে একটা ভোঁতা আওয়াজ করেছিল বড় সাহেবের খাস কামরায়। তারপরেই গোলমালের শুরু।

বড সাহেব মুখ তুলেই গাল ফুলিয়ে হাসলেন। বিস্ময়কর। তারপর চেয়ারের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বসতে বললেন। কেলেঙ্কারি।

বসতেই হল রমেশকে।

বড সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'আর ক' বছর চাকরি আছে তোমার রমেশ ?'

উত্তরটা দিতে কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু বড কর্তার পরের প্রশ্নেই সে ঠোক্কর খেল। তিনি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসেছেন। জিগ্‌রী দোস্তের মতো শোনালো তাঁর উচ্চারণ, এত দিন ধরে এক্ পোস্টে কাজ করছ, প্রমোশন পেতে ইচ্ছে করে না ?'

এক কথায় 'হ্যাঁ' বলে সেরে দেওয়াটাই সত্যবাদিতা হত। কিন্তু সেইটাই সবচেয়ে শক্ত। এমন প্রশ্ন করার কারণটা কি সেটা বোঝাবার চেষ্টা না-করে কি উত্তর দেওয়া যায়! রমেশ একটু সময় নিয়ে বলল, 'ইচ্ছে করলেই কি আর সব হয় হুজুর।' এই দার্শনিক মন্তব্য বয়সের গুণে রমেশের মুখে দিব্যি মানিয়ে গেল।

বড় সাহেবকে বেশ খুশী দেখাল। তিনি ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিলেন, কেন রমেশের প্রমোশন আটকে আছে। না, দোষ রমেশের নয়। দোষ সুযোগের। সুযোগ তৈরি না হলে ভাগ্য ফেরে না।

রমেশ চুপ করে শোনে। বোঝে, আসল কথাটা এইসব কথার পিছনে বসে আছে।

'প্রমোশনের একটা সুযোগ কিন্তু আমি তোমায় এক্ষুনি করে দিতে পারি।' বড় সাহেব চেয়ারে ঠেস দিয়ে রমেশের দিকে তাকিরে বিজয়ীর মতো হাসলেন।

রমেশও একটু হেসে ফেলল। তার কাছে কৃতার্থের হাসিটাই তো দাবী করেছেন বড় সাহেব।

'সামান্য একটা কাজ আছে, করতে পারলেই প্রমোশন।'

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়ল রমেশ, 'কাজ করার জন্তেই তো চাকরি হুজুর। আপনার অর্ডার তামিল করাটা আমার ডিউটি।'

বড় সাহেব বললেন, 'না, মানে—এটা ঠিক অর্ডারের ব্যাপার নয়। মানে, তুমি রাজী না হলে কোনো জোরাজুরি করা হবে না।'

আবার গুলিয়ে গেল। রমেশ রাজী না হলে, বড় সাহেব কাজ দেবেন না···রমেশের ইচ্ছে মাফিক তাকে হুকুম করা হবে···

'আরে অত ভাববার কিছু নেই। কাজটা সামান্যই। তবে হ্যাঁ, মনের জোর দরকার—'

এরপর রমেশের আর রাজী হতে অসুবিধা থাকতে পারে না। মনের জোর মানেই বুকের পাটা। সেটা তার আছে বলেই বিশ্বাস। 'হুকুম করেই দেখুন না—' শব্দে আত্মবিশ্বাস এল।

'শোনো রমেশ!' বড় সাহেবের গলাটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে ওঠে। 'তোমাকে একটা জঘন্য পাপীকে সাবাড় করে দিতে হবে।'

'হুজুর?'

'একটা কুখ্যাত অপরাধী। একটা খুনে। এই হত্যাকারীকে খুন্ করতে হবে তোমায়। পারবে?' বড় সাহেবের গলাটা আর ভারী শোনাচ্ছে না। উচ্চারণের আগে শব্দগুলোকে আর একে একে ওজন করে বাছাই করছেন না। তিনি উত্তেজিত।

রমেশ নড়ে চড়ে বসল। 'একটা খুনেকে ফাঁসি দিতে হবে, এই তো?'

রমেশ সাদামাটাভাবে মোদ্দা কথাটা বুঝে ফেলতে বড় সাহেব আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এক্ হ্যাঁচকায় কোমর থেকে রিভলবারটা টেনে নিয়ে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দেন। 'ফাঁসি নয়—ফাঁসি নয়—ফাঁসি দেবার জন্যে অন্য লোক আছে। এই রিভলবার দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিতে হবে। যদি পারো, পরের দিনই প্রমোশন।'

এবার রমেশের অবাক হবার পালা। ''রিভলবার দিয়ে গুলি করে মারবার হুকুম্ পাস্ হয়েছে আদালতে?'

তাঁর বক্তব্যের এমন অর্থান্তর হবার সম্ভাবনা আছে, বড় সাহেব ভাবতে পারেন নি। উত্তেজনাটা যেন ছ্যাক্ করে নিভে গেল। আবার চেয়ারে ঠেস রাখলেন। উপলব্ধি করলেন, আরেকটু পিছিয়ে গিয়ে শুরু করতে হবে, না হলে রমেশ বুঝবে না। ও এখনো ধরতে পারছে না।

দেশের হালফিল অবস্থা পরিক্রমা শেষ করে তিনি সরাসরি উপমায় চলে আসেন, 'ট্রামে বাসে কোনদিন পকেটমার ধরা পড়তে দেখেছ ?'

রমেশ জানায় একবার দেখেছিল।

'কি রকম ধোলাইটা লাগিয়েছিল ?'

'ওহ্—দারুণ! শালা জীবনে আর পকেট মারবে না বোধহয়!'

বড় সাহেব হো-হো রবে হেসে উঠেই থমকে গিয়ে বজ্রপাত ঘটানোর মতো চমক সৃষ্টির প্রয়াসে ফিসফিস করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন, 'তুমি কি জানো, ওই পকেটমারটাকে আদালতে হাজির করলে বেকসুর খালাস পেয়ে যেতে পারত, আর তোমরা, যারা ওকে পিটিয়েছ, তাদের বেশ কয়েক মাস শ্বশুরবাড়ি বাসের ব্যবস্থাও একই সঙ্গে পাকা হতে পারত ?'

রমেশ সশব্দে কোন ঐকমত প্রকাশ না করলেও যুক্তির টানে তার ঘাড় নড়ে গেল।

'এও ঠিক একই ব্যাপার, বুঝলে ? সব সময় আইন আদালতের ওপর নির্ভর করতে হলে এ সমাজকে আর টিকিয়ে রাখা যাবে না। আমরা বুঝতে পারছি লোকটা খুন করেছে—কিন্তু আদালতে যে যাব—সে তো অনেক দিনের ব্যাপার। তালেগোলে ছাড়াও পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেটা আমরা কিছুতেই হতে দিতে পারি না। নাটের গুরুদের শাস্তি দিতে না পারলে তাদের চেলারাও তো খুনোখুনি শুরু করে দেবে। তখন ? বুঝতেই তো পারছ, দিনকাল যা পড়েছে…'

রমেশ মনে মনে ঘটনাগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে নিল। একটা লোক খুন করেছে। মানে বড় সাহেব জানেন, সে খুন করেছে। সাক্ষ্য-প্রমাণ, মামলা মোকদ্দমার মধ্যে না গিয়েই তাকে খতম করে দিতে হবে। খতম না-করে উপায় নেই, তা না হলে আরো অনেকের সর্বনাশ হবে।

রমেশ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জানাল, 'লোকটা খুন করেছে বলছেন যখন, তাকে মারতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমার দিকটাও দেখবেন হুজুর —শেষে আমায় আবার কোর্টকাছারি করতে না হয়!'

বড় কর্তা চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে রমেশের পিঠে স্নেহের হাত রাখেন। রমেশের মনে সন্দেহের শেষ রেশটুকুও তিনি মুছে দিতে চান, 'জানো, আমাকে ওরা বলেছিল—বলেছিল—রমেশকে দিয়ে এসব হবে না। আমার কিন্তু বিশ্বাস ছিল তুমি পারবে।'

রমেশ উঠে দাঁড়াল।

বড় সাহেব বললেন, 'আমি তোমায় সময় মতো খবর দেব। দু' তিন দিন রিভলবার চালানোর একটু তালিম নিতে হবে তার আগে। ভ্যান্ থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার পর···তাছাড়া অন্ধকারের মধ্যে তো···'

রমেশ স্যালুট ঠুকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটার নাম কি হুজুর?'

'লোকটা? কোন্ লোকটা?' রমেশের প্রশ্নে ভুরু কুঁচকে গেল সাহেবের।

অবাক হল রমেশ। এখুনি বলল, লোকটা যে খুনী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, আর তার নামটাও মনে নেই। রমেশের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, হাসপাতালে ডান চোখটা অপারেশন করতে গিয়ে রমেশদের পাড়ার একটা লোক তার বাঁ চোখটা, মানে ভালো চোখটাকেও হারিয়েছে ডাক্তারের বেখেয়ালে। রমেশ বলল, 'ওই যে, যে লোকটা খুন করেছে বললেন···'

'ও—হো, বুঝেছি! আরে, নাম কি আর কারুর মুখস্থ থাকে। এরকম কেস্ তো আর একটা নয়। জেলে জেলে—'

রমেশ নিজের অজ্ঞাতেই বড় সাহেবকে বাধা দিল, 'হুজুর—আমার একটা আর্জি আছে।'

পছন্দ না হলেও, 'বলো' কথাটা মুখ দিয়ে তাঁকে বার করতেই হল।

'আমি কাকে মারছি, একেবারে না জেনেশুনে—মানে, লোকটার নামধাম, কাকে খুন করেছে—এগুলো জানা থাকলে—'

'বুঝেছি বুঝেছি। তোমার মনের দিক থেকে তুমি পরিষ্কার থাকতে পারো, এই তো?' বড় সাহেব তার বুকের কথাগুলোকে সাফ্ সুতরো গড়ে দিতেই হালকা বোধ করল রমেশ। হাসি মুখে ঘাড় নাড়ল। 'বেশ তো—আমি তোমাকে সবই জানিয়ে দেব—যাকে সাবাড় করতে হবে তার ইতিহাস ভূগোল, সব কীর্তিকথা জেনেশুনেই তারপরে না হয় কাজে বেরিও।'

রমেশ জোরালো এক স্যালুট ঠুকে বেরিয়ে এল।

এ অবধি গল্পটা যুক্তির পায়ে ভর রেখে সম্ভাব্যতার ধারকাছ দিয়েই বেশ সড়সড় করে এগিয়ে গেছে। তার জন্যে কল্পনাকে খোঁচা মেরে দৌড় করাতে হয়নি। এবার কিন্তু একটা আচমকা যোগাযোগে ঘটানো দরকার। কেন এরকম হল, বা হল যদি ঠিক এই ভাবেই বা হল কেন, এসব প্রশ্নের কোন

সদুত্তর দেওয়া যাবেনা। শুধু এইটুকু হয়তো সাফাই হিসাবে গাওয়া যেতে পারে যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে পাহাড়ী নদীও কি আর ভৌগোলিক নির্দেশ অমান্য করে না? তবে যোগসাজসের ব্যাপারটা মেনে নেবার পর, ঘটনাস্রোত যে আবার যুক্তির খাল ধরেই এগোবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হুজুরের ঘরে রমেশের দ্বিতীয়বার ডাক পড়ার আগেই সে মনসামঙ্গলের বাসর কক্ষের আধুনিক সংস্করণ, গোয়েন্দা বিভাগের স্ট্রংরুমে বসে দু'দিন ধরে বোমা সাইজের দু'টো ফিতে আঁটা ফাইল উল্টেপাল্টে দেখেছে। এর মধ্যেই সেই খুনে লোকটার তাবৎ ঐতিহাসিক নথিপত্র জমা আছে, যে-লোকটাকে ইহলোকচ্যুত করার মঙ্গলকর্মের ভার ইচ্ছে করলেই রমেশ এখন গ্রহণ করতে পারে।

রমেশের ঘরে ঢোকাটাই বড় সাহেবের খুশীর কারণ হল। 'বলো রমেশ, ভেবে দেখলে তো সব। ঠিক বলেছিলাম কিনা বলো?'

রমেশ উত্তর দিতে পারল না।

'কি হল, ফাইল দেখনি নাকি?'

রমেশ জানাল ফাইল দেখেছে।

'তোমার যা-যা জানার ছিল নিশ্চয় জানতে পেরেছো। আর কোন দ্বিধা নেই নিশ্চয়?'

রমেশ বলল, 'লোকটা একটা খুন করেছে। চাকু মেরে।'

বড় সাহেব বললেন, 'ঠাণ্ডা মাথায়।'

রমেশ বলল, 'কিন্তু খুন করাটাকে ও অন্যায় বলেই মানছে না দেখলাম। ওর লেখা চিঠিপত্রে দেখছিলাম, পরিষ্কার লিখছে—এরকম একটা লোককে বাঁচিয়ে রাখা একমাত্র নপুংসকেরই শোভা পায়।'

'তাহলেই বোঝো—' রমেশের বিস্ময়ের সুরকে কোনো আমলই দেন না বড়সাহেব, 'মানুষ খুন বলে কথা অথচ তার জন্যেও তার এতটুকু আপসোস্ নেই। বিবেকের কোন বালাই নেই। এই ছাখোনা—তুমিও এক কথায় রাজী হতে পারোনি। আমি বলা সত্ত্বেও সরকারী কর্মী হয়ে, আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক হয়েও, তুমি রাজী হতে পার নি। না জেনে শুনে চরম শাস্তি দিতে…'

'হুজুর—আমার কিন্তু মনে হচ্ছে লোকটা ভুল বুঝে কাজটা করেছে।

আপনি দেখেছেন কি-না জানি না, যে-লোকটাকে ও খুন করেছে তার সম্বন্ধে ও এমন সব কথা লিখেছে, মানে লোকটার চরিত্র সম্বন্ধে, এখন আমারই খুব সন্দেহ হচ্ছে। অভিযোগগুলো যদি সত্যি হয়, একবার খোঁজ নিয়ে দেখলে হত না—'

'কি বলতে চাও তুমি ?' বড় সাহেব যথার্থ কারণেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

'হুজুর আপনি বরং আমাকে অন্য কোনো লোকের ভার দিন। অন্য কোন খুনীর। আপনি তো বলছিলেন, এরকম আরো···' বড় সাহেবের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে এতগুলো কথা বলে ফেলল রমেশ।

'বুঝেছি—না হে, না, এ তোমার কম্মো নয়। তোমার দ্বারা হবে না।'

'আপনি ভুল বুঝবেন না হুজুর। নিশ্চয় পারব আমি। এতো দেশের কাজ—পাঁচ জনের ভালর জন্যে—কেন করবো না! আপনি আমাকে আরেকটা সুযোগ দিয়ে দেখুন। অন্য কোন খুনীর ভার ছেড়ে দিন আমার ওপর, দেখবেন—এই রমেশের হাতে তার নিষ্কৃতি নেই।' রমেশ কর্তব্য ও গর্বকে উচিত মাপে মিশিয়ে নিয়েছে।

বড়সাহেব তবু উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। 'এই তো সুযোগ দিলাম—'

রমেশের চোখেমুখে একটা আকুতি ফুটল, একটা কথা বোঝাতে চেয়েও মানুষ যথাযথ ভাব-পরিবহণে অসফল হলে যা হয়। 'আপনি বিশ্বাস করুন, এই লোকটা আমায় ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছে। অনেক লেখাপড়া জানা লোক, হুজুর। আপনিই বলুন, খুনী যারা তারা কখনো কবিতা লিখতে পারে, জন্মেও শুনিনি।'

কথা থামিয়েই বড় সাহেবের চোখের দিকে তাকাল রমেশ। কবিতা লেখার খবরটা নিশ্চয় তিনি জানেন না, 'দু'তাড়া কবিতা রয়েছে হুজুর ফাইলের মধ্যে। খানাতল্লাশির সময় লোকটার ঘরে পাওয়া গেছল। আমি তো জীবনে একটা এক পাতা লম্বা চিঠি লিখতে পারিনি।'

রমেশকে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেবার অভিপ্রায় বড় সাহেবের ছিল না। কেউ যদি সেধে নিজের প্রমোশনের লোভনীয় সুযোগ হাতছাড়া করে তার জন্যে অপরের মাথাব্যথা থাকতে পারে না। তবু রমেশকে তিনি আরেকটা সুযোগ দিতে সম্মত হয়ে গেলেন। মূর্খামিও কখনো কখনো মানুষের সম্পদ রূপে গণ্য হয়। কবিতা লেখাটা রমেশের কাছে খুবই উচ্চস্তরের ক্রিয়া, এটা অনুভব করে বড়বাবু বোধহয় কৌতুকবশেই তার দুর্বলতার অপরাধ মার্জনা করে দিলেন। 'আরেকটা সুযোগ তোমায় দেব। এই শেষ কিন্তু—'

রমেশের স্যালুটে প্রমোশনের সম্ভাবনা জিন্দা থাকার খুশি ও কবিতা-লেখক সন্দেহভাজন খুনীকে হালাল করতে না-হওয়ার নিশ্চিন্ততা, যুগপৎ ব্যক্ত হল।

দ্বিতীয় সুযোগ রমেশ যথা সময়েই পেল। এর মধ্যে আর কোন দুর্ঘটনা-জাতীয় যোগাযোগের বালাই নেই। সাতের দশকে খুনোখুনির বাতাবরণের উল্লেখ করার মধ্যে কষ্টকল্পনার কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। বড় সাহেবের নির্দেশ অনুসারে সরকার অ-অনুমোদিত হত্যাকারীদের সাধারণ গুণাবলী সংবলিত একটি অতি সুলভ সন্তরের চরিত্রের সঙ্গে নথিপত্র যোগে পরিচয় ঘটল রমেশের।

প্রথম দফার মতো দু'দিন ধরে কাগজপত্রে মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকেনি রমেশ। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফাইল জমা দিয়ে চলে গেছে। তারপর দু'দিন অ্যাব্‌সেণ্ট। ক্যাজুয়াল ডুব। তৃতীয় দিনে হাজিরা খাতায় সই করতেই এত্তেলা মিলল সাহেবের।

রমেশের স্যালুটে বেজায় নিরুৎসাহীর জড়তা প্রকাশ পেল।

'কি, দেখলে ফাইলপত্র?'

ঘাড়টা নড়ল রমেশের।

'কোন সন্দেহ আছে নাকি আবার?'

না, রমেশের কোন সন্দেহ নেই।

এবার যার ভার নিতে বলা হয়েছে, সে গোটা দুয়েক খুন বোধহয় করেইছে।

রমেশের নিরুত্তরতাকে সম্মতি বিবেচনা করে বড় সাহেব কয়েকটা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ শুরু করলেন—কখন, কিভাবে ও কোথায়, কর্ম-সম্পাদনের সময়, উপায় ও স্থানের ব্যাখ্যা।

রমেশ হঠাৎ বাধা দিল, 'ওকে আরেকটা সুযোগ দিন হুজুর।'

বিস্ময়ের শুচিতা নিয়ে বড সাহেবের মুখ ফাঁক করিয়ে একটি 'অ্যাঁ' ধ্বনিত হল।

'আজ্ঞে, আমার মনে হয়, ওকে একবার সতর্ক করে দিয়ে দেখলে হত। যদি ভাল হয়ে যায়—মানে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া যে এরপরেও যদি নিজেকে শুধরে না নেয় তাহলে—তাহলে আর তার রক্ষে নেই।'

রমেশ কি পাগল হয়ে গেল! বড় সাহেবের মুখে কথা সরে না।

'আপনি যদি আমায় হুকুম দেন, আমি নিজে ওকে বুঝিয়ে বলব। তাতেও যদি কাজ না হয়… তখন দেখবেন কি করি—রিভলবার-টিভলবার লাগবেনা হুজুর—টুঁটি টিপে ব্যাটাকে—'

বড় সাহেব চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন, 'গেট্ আউট্! গেট্ আউট্ আই সে—আমার সঙ্গে মস্করা হচ্ছে, না?'

চিৎকারের হিংস্রতা পাহারারত দু'জন অস্ত্রধারী দেহরক্ষীকে আঁকশি মেরে টেনে আনল ঘরের ভিতরে!

'ইস্‌কো নিকালো হিঁয়াসে!'

রমেশ সেই মুহূর্তে অপমানিত বোধ করেছিল, না, প্রমোশনের সুযোগ হারাবার জন্য নাচার বেদনা, অনুমান করার চেষ্টা করে লাভ নেই। তবে রমেশ আত্মপক্ষ সমর্থনে প্রয়াসী হয়েছিল অস্ফুট কণ্ঠে, 'দোষ দিলে তো চলবে না, বলেছিলেন একটা খুনী বদমাইশের কথা—কিন্তু এ তো শিশু! গাল টিপ্‌লে দুধ বেরোবে। তেরো বছরটা কি একটা লোকের বয়স! না না, যে যাই বলুক—শিশু হত্যা মহাপাপ—মহাপাপ—'

এই ঘটনার পরেও আমাদের রমেশকে দিয়ে বড় সাহেবের কাছে আরেকবার আর্জি পেশ করালে যুক্তির প্যাঁচে গেরো লাগার উপক্রম হত না, কারণ কোন প্রাপ্তবয়স্ক নির্ভেজাল খুনী দুশমনকে নিধন করার ব্যাপারে রমেশের দিক্ থেকে কখনোই কোন দ্বিধা ছিল না। তাছাড়া প্রমোশনের টোপটাও ছিল! কিন্তু রমেশের আর্জি বড় সাহেবের দরবারে পৌঁছেছে ধরে নিলেও, তার প্রমোশন যে হয়নি সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে কোন বাধা নেই। বড় বাবুকে রুষ্ট করেছে, এটাই তার প্রমোশনের পথে প্রধান বাধা, এরকম ভেবে নেওয়াটা শর্ট-কার্ট ফয়সালার দোষে দুষ্ট হবে। তার চেয়েও বড় বাধা ছিল, যা সুধী জনে গ্রাহ্য করবেন। শাস্তি পাবার লোকের তুলনায় প্রমোশনকামী শাস্তি দেবার পুলিশের সংখ্যা যদি ঢের বেশী হয় তাহলে খুনেদের খুন করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেতেই পারে। ফলে, রমেশ সুযোগ পাওয়ার আগেই সব খুনেদের সাবাড় হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

আরেকবার মনে করিয়ে দিই, রমেশ বলে সত্যিকার কেউ ছিল না। কিন্তু সত্যিই যদি থাকতো তবু যে তার প্রমোশন হত না সেইটুকু বোঝাবার জন্যেই গল্প লেখার দুর্বুদ্ধি।

বাড়ির ছাদে আলসের ওপর বটগাছটা ক্রমেই একটা ভয়ঙ্কর চেহারা ধারণ করছে। ছাদ ও দেওয়াল ফাটিয়ে তার শেকড় যে কতদূর প্রসারিত হয়েছে কেউ জানে না। সমস্ত বাড়টাই বিপন্ন। তা বয়স তো বাড়িটার কম হল না। এই গাছটা যে কবে জন্মাল, সেকথা কেউই বলতে পারে না। এই বাড়ির প্রবীণতম বাসিন্দাও বলেন, তাঁর ঊর্ধতন পুরুষও এই বটগাছটাকে দেখেছেন। গাছটা তখনো নাকি বাড়ির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করত। হয়তো যে চুন-সুরকি বা মাটি (ইঁট তো পোড়া মাটি) দিয়ে বাড়ি তৈরি তার মধ্যেই বটের বীজ ছিল। মানে গাছটার বয়স হয়তো বাড়িটার সমান।

গাছটাকে কেউ উপড়ে ফেলার চেষ্টাই বা করেনি কেন? বাড়ির বাসিন্দারা কেউই কি নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে এতটুকু উদ্বিগ্ন নয়? চেষ্টা একেবারে হয়নি বললে ভুল হবে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন, দুঃসাহসী ব্যক্তি, অনেক সময় দু'একটি পরিবারও উদ্যোগী হয়েছিল টেনে উপড়ে ফেলার জন্য। কুড়ুল চালিয়ে কেটে ফেলার জন্য। কিন্তু কেউই শেষ পর্যন্ত রাজী হয়নি। কারণ? কারণ একটাই। এটা ব্যক্তিগত উদ্যোগের ব্যাপার নয়। তাছাড়া গাছটাকে টানাটানি করলেই



বাড়ির কথা

ওপর তলার ছাত থেকে সিমেন্টের চাঁই খসে পড়ে। এমনিতেই ফুটি-ফাটা ছাদ, বর্ষাকালে ঘরে জল পড়ে, দেওয়ালে ড্যাম্প, নোনাধরা—তার ওপর এইসব টানাটানি সহ্য করতে না পেরে পুরো ছাদটাই যদি খসে পড়ে তো কেলেঙ্কারি। ফলে বাসিন্দারাও অনেকে এইসব প্রয়াসকে ঘোরতর সন্দেহের চোখে দ্যাখে। যাও বা মাথা গোঁজার আস্তানাটুকু আছে, তাও হয়তো শেষ পর্যন্ত হারাতে হবে। তার চেয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই বোধহয় মঙ্গল। আসলে গাছটাকে সমূলে উৎপাটন করতে হলে সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি এই দীর্ঘকাল। কেন সম্ভব হয়নি তারও কারণ আছে। সেটা জানতে হলে এই বাড়ি এবং বাড়ির বাসিন্দাদের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

এই সেকেলে জরাজীর্ণ বাড়িটি কে কবে গঠন করেছিল কেউ জানে না। এমন কি বর্তমানে কে যে এর মালিক সেটাও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। আমাদের ছোটবেলায় শুনতুম জাহাজে করে দূর দেশ থেকে মাথায় মুকুটপরা একটা ফর্সা ফর্সা মেয়ে আসত তখন মাসে মাসে বাড়ি ভাড়া আদায় করার জন্য। তারপর ইস্কুলে পড়বার সময় কে যেন বলেছিল, প্যান অ্যামেরিকান এয়ারওয়েজ-এ চড়ে বাড়ির মালিক কচিৎ কখনো পরিদর্শনে আসেন। এখন আবার কানাঘুষো, বাড়ির মালিক এলে এরোফ্লোটে চড়েই আসেন। এ বিষয়ে রীতিমতো মতপার্থক্য আছে, কারণ কয়েকমাস আগেই এরোফ্লোট আর আর প্যান অ্যামেরিকান-এর মধ্যে একটা বিজ্‌নেস ডিল্ স্বাক্ষরিত হয়েছে। যাকগে, কে মালিক না জানলেও এটা আমরা নথিপত্র যোগে প্রমাণ করে দিতে পারি যে, এ বাড়িতে যারা বাস করে তারা সবাই ভাড়াটে। এই বিশাল বাড়িতে কত ঘর আছে, কতই বা তার ভাড়াটের সংখ্যা গুনে বলা সম্ভব নয়। আদমশুমারি কয়েক বছর অন্তর হয় বটে কিন্তু সেটা তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। যাই হোক, কথাটা হল বাড়ির বাসিন্দাদের সবাইকে ভাড়া দিতে হয় এবং ভাড়াটা আদায় করার জন্য স্বয়ং মালিক কখনোই আসেন না। এই বাড়ির কিছু পাহারাদারই সেই কাজটা করে। এবার নিশ্চয় সমস্যাটা বোঝা যাচ্ছে। স্বয়ং মালিক যখন বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে আগ্রহী নয়, বাড়ির বাসিন্দারা কেন তা করবে? খাবার জলের পাইপ ফেটে গেলেও মালিক পাত্তা দেয় না যেখানে, মালিকের সম্পত্তিকে রক্ষা করার দায়িত্ব ভাড়াটেরা কেন বহন করবে। যুক্তিটা এক দিক দিয়ে ঠিক হলেও আরেকটা বিচার্য বিষয় আছে। মালিক

তো আর এখানে বাস করছে না। ছাদ যদি ভেঙে পড়ে তখন ভাড়াটেরাই তো মরবে। তখন কি সেটা চোরের ওপর রাগ করে মেঝেয় ভাত খাবার সামিল হবে না! বাড়িটা ভেঙে পড়লে ক্ষতিটা কার? ভাড়াটেদেরই তো! না, অত জোর দিয়ে বলা যায় কি তা? বাড়িটা ভেঙে পড়লে মালিকেরও তো ক্ষতি। ভাড়াটেরাই যদি মারা পড়ে, ভাড়া আসবে কোত্থেকে? তাহলে? এমনও তো হতে পারে যে মালিক হয়তো ভাড়াটেদের গৃহহীন হবার ভয় দেখাতে চাইছে!

আসলে এটা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, ভাড়াটের বেয়াদপি বন্ধ করবার জন্য। চোখ-রাঙিয়ে মালিকের কাছ থেকে কিছু আদায় করা সম্ভব নয়, এটা মর্মে মর্মে যাতে বোধ করতে পারে। বাড়ি ধ্বসে পড়লে ভাড়াটেদের প্রাণ নিয়েই তো টানাটানি হবে। মালিকের আর কি? কিছু আর্থিক লোকসান।

তাহলে কি কোনো সুরাহাই হবে না। ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিতে হবে। বটগাছ বাড়ুক, ছাদ ফাটাক—বাড়ি ভেঙে পড়ুক—মালিকও কিছু করবে না, ভাড়াটেরাও একজোট হবে না।

কি করে একজোট হতে পারে ভাড়াটেরা? আদৌ সেটা সম্ভব কি? সম্ভব, তবে ভাড়াটে হিসাবে নয়। একজোট হবার জন্য দরকার মালিককে উচ্ছেদ করার জন্য লড়াই শুরু করা। মালিক উচ্ছেদ হলে বাসিন্দারাই এই বাড়ির মালিক হবে। তখন তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজেদের বাড়িকে বাঁচাবার জন্য উঠে পড়ে লাগবে। কিছুতেই আর তারা তখন পেছপা হবেনা। এমন কি পুরনো বাড়িটাকে যদি পুরো ভেঙে ফেলতে হয়, সবাই মাঠে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তবু নয়। কারণ, তখন তারা জানবে, ক'দিনের মেহনত, কৃচ্ছসাধনের পর, তারা নতুন একটা বাড়ি পাবে, নিজেদের বাড়ি, নতুন জীবন শুরু হবে।

মুখে বলা এক কথা আর কাজে করা অন্য। মালিক কি সুড়সুড় করে অধিকার ছেড়ে চলে যাবার পাত্র? তাহলে তো সমস্যাই ছিল না। মালিককে হঠাতে দরকার বলপ্রয়োগ—সম্মিলিতভাবে। সেই জোট বাঁধার সমস্যা। ঘর ঘর ঠাঁই ঠাঁই। এরই মধ্যে বাড়ির সবচেয়ে নিচুতলায় যারা থাকে, মিস্ত্রী আর মালীর দল, তাদের মধ্যেই তবু যা একতা।

অনেক পণ্ডিত আবার বাড়ির মালিকানা দাবি করাটাকে ন্যায়-অন্যায়ের দৃষ্টিতে বিচার করতে চান। বাড়িতে যারা বাস করছে, তারাই বাড়ির আসল

মালিক, এ যুক্তি তাঁরা মানতে চান না। কর্মফল ও পুনর্জন্মে তাঁরা বিশ্বাসী। এদের দলে পাওয়ার আশা আমরা প্রায় ত্যাগই করেছিলাম কিন্তু হঠাৎ এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে গেল। আমাদের পাশের ঘরের তরুণ ঐতিহাসিক এক আবিষ্কার করে বসলেন। তাঁর মতে এই বাড়িটার আসল মালিক আমরাই। কথাটা এতই অভিনব যে শুনলে হকচকিয়ে যেতে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের যুক্তিটা সরল ও যুক্তিগ্রাহ্য। তিনি বলেন, বাড়ির বাসিন্দাদের চেহারার দিকে নজর দিলেই বোঝা যায় যে, এদের পূর্ব-পুরুষরা সবাই ছিল এই বাড়ি-সংলগ্ন অঞ্চলেরই আদিম বাসিন্দা। অনেক জাতির অনেক রক্ত হয়তো পরবর্তী কালে মিশেছে কিন্তু বংশগতিতে কোথাও না কোথাও একজন স্থানীয় আদিবাসীর উপহার আছেই, না হলে চেহারার হাজারো বৈষম্যের মধ্যে কয়েকটি সাদৃশ্যই বা থাকবে কেন। এরপর আর বাড়ির ওপর ভাড়াটেদের দাবী অপ্রমাণ করা সম্ভব নয়। কে না জানে যে আদিমকালে মানুষের সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না। এটা আমার, ওটা তোমার—এরকম কোন ভাগাভাগির বালাই ছিল না। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত? বর্তমান ভাড়াটেদের কোন না কোন উর্ধতন পুরুষ একদিন না একদিন বিনা শর্তে এই এই বাড়িতে বাস করেছেন। হয়তো বাড়ির চেহারাটা তখন এরকম ছিল না, কিন্তু তাতে কি?

এই বড় ঐতিহাসিক আবিষ্কারের পর ভাবা গেছল বাসিন্দারা সবাই এবার এককাট্টা হবেই। কিন্তু তা হয়নি। হতে দেয়নি কিছু ভাড়াটেই। কিন্তু শুধু ভাড়াটে বললেই তাদের পরিচয় দেওয়া যাবে না। এরা সুবিধাভোগী ভাড়াটে। এরা আবার তাদের আবাসকে সাব্‌লেট করেছে। তার মানে বড় মালিকের অধীনে এরা আবার ছোট মালিক হয়ে বসেছে। কি করে হল? আমাদের পরিবারের কথাই ধরুন। ছোটবেলায় তিনটে ঘর নিয়ে আমরা বাস করতাম। তারপর বড়দির বিয়ে ঠিক হল। টাকা পয়সার অভাব। বাধ্য হয়ে বাবা একটা ঘর বেচে দিলেন। আরেকজন ভাড়াটে সেই ঘর কিনে নতুন ভাড়াটে বসাল। আমরা এখন দুটো ঘরে বাস করি, আরো গরীব হয়েছি আর যে লোকটা আমাদের ঘরটা সাবলেট করেছে সে আরো বড়লোক হয়েছে।

যাকগে সে কথা থাক। আসল কথা হল ভাড়াটেদের মধ্যে এই সুবিধা-ভোগী নতুন মালিকরা সব ঝঞ্ঝাটের মূলে। তারাই এখন খোদ মালিকের

সবচেয়ে বিশ্বস্ত তাঁবেদার আজ্ঞাবাহী। তারাই পাহারাদার নিয়োগ করে, তাদের তত্ত্বাবধানেই ভাড়া আদায় করা হয়। কিন্তু ভাড়াটেরা স্বয়ং বাড়ির মালিক হয়ে বসলে এদের সাবলেট করার অধিকারই লোপ পাবে। তাই ভাড়াটে হয়েও এরা ভাড়াটেদের দলে নেই, বড় মালিকের দলে।

বড় মালিক ও তার চ্যালা ছোট মালিকদের বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ভাড়াটেরা বহুদিন যাবতই দল গড়ার চেষ্টা করে আসছে। ঠ্যাঙাড়ে গুণ্ডা দিয়ে সেইসব দলগড়ার চেষ্টাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার কাহিনী আমরা মা-ঠাকুমার মুখেও শুনেছি। এক সময় তো অবস্থা এত অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল যে সবাই ভেবেছিল এবার একটা হেস্তনেস্ত হবেই। কিন্তু অদ্ভুত একটা চাল চালল মালিক সাহেব। হঠাৎ একদিন সে ঘোষণা করে দিল, সে নিজে থেকেই সব অধিকার ত্যাগ করছে। বাড়ির বাসিন্দারাই এখন থেকে বাড়ির সব তদারকি করবে। তবে, এসব কাজে তারা একেবারেই অনভিজ্ঞ তো, তাই চলে যাবার আগে সে তার মনোনীত প্রতিনিধির হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিয়ে যাবে। বুঝতেই পারছেন যে মালিক সাহেবের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হচ্ছে বর্তমানের ওই সুবিধাভোগী ভাড়াটেরা, ছোট মালিকেরা।

ব্যস, আগুনে ছাই ছাপা পড়ল। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, এটা বুজরুকি, তোমরা কেউ কান দিও না। জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, খোঁজ নাও, দেখবে—এই বাড়ির জল সরবরাহকারী পাম্পটার ওপর কিন্তু মালিক অধিকার ছাড়েনি। বিদ্যুৎ তৈরির সব মেশিন তাঁর কারখানাতেই তৈরি হচ্ছে।

কিন্তু এসব কথা বেশির ভাগ লোকেরই মনঃপূত হল না। তাছাড়া ভাড়াটেরা বেশির ভাগই নিরক্ষর। তারা সব ব্যাপারটা জানতে বা বুঝতেও পারলেন না। মালিকের স্থানীয় প্রতিনিধিরা চেঁচাতে লাগল, আমরা এখন স্বাধীন। নিজেদের বাড়িকে এবার আমরা নিজেরাই গড়ব। নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরা নির্বাচন করব। বাসিন্দাদের সবার এখন থেকে সমান অধিকার।

কথাগুলো অনেকেরই মনে ধরল। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কি হয়। একটা জিনিস সবার চোখ এড়িয়ে গেল। সমান অধিকার যাদের দেওয়া হল তাদের অবস্থা কিন্তু সমান নয়। কেউ ছাতে কাঁথা বিছিয়ে শোয়, কেউ চল্লিশখানা ঘর নিয়ে রাজত্ব করে। এই অবস্থাকে রক্ষা করেই সমান অধিকার দেওয়া হল। মানে, প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার।

একের পর এক বছর ঘোরে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই বাড়ির সংস্কারের নতুন নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসে কিন্তু তাদের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার পর দেখা যায় কোন উপকারই হচ্ছে না। বটগাছটা ক্রমেই ঢ্যাঙা হয়ে উঠছে, তার গুঁড়িটা আরো মোটা ও শক্ত হচ্ছে। কিন্তু ওদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেই শাসকরা বলে ধৈর্য ধরো আর ক'টা দিন। আমাদের বাড়ির বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছে নতুন অ্যাসিড তৈরি করার জন্য। ওই অ্যাসিড কয়েক ব্যারেল ঢাললেই সমূলে বটগাছের ভবলীলা সাঙ্গ করে দেওয়া যাবে। এখন বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী উপায়েই সব সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। এসব কাস্তে কুড়ুলের ব্যাপার নয়। যুক্তির দিক দিয়ে প্রথম শ্রবণে বক্তব্যটি নিখুঁত। কিন্তু ওই বিষ অ্যাসিড তৈরি করতে কতদিন লাগবে? ততদিন কি বাড়িটা টিকবে? এ প্রশ্নটাও তো ন্যায্য প্রশ্ন। তবে এরও চেয়ে বিস্ময়কর কি জানেন, বিজ্ঞানীরা কিন্তু ওই বিষ অ্যাসিড বহুকাল হল তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু বটগাছ মারার জন্য অ্যাসিড পাওয়া যাচ্ছে না। অ্যাসিড যা তৈরি হচ্ছে তার সবটুকুই খরচ হয়ে যাচ্ছে হয় গোলা বারুদ বানাতে, নয় তো রঙ বা ওষুধ তৈরি করতে। অ্যাসিডের উৎপাদন আরো বাড়াবার জন্য চেষ্টা চলছে, উৎপাদন বাড়ছেও কিন্তু তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গোলাবারুদ, রঙ আর ওষুধের প্রয়োজন। কারণ বাড়ি যত জীর্ণ হচ্ছে ততই প্রয়োজন পড়ছে আরো ঘন ঘন দেওয়ালগুলো রঙ করার। বাড়ির পরিবেশ যত অস্বাস্থ্যকর হচ্ছে, রোগের আক্রমণও বাড়ছে আর ততই ওষুধ খেতে হচ্ছে বেশি বেশি। আর অবস্থার এই ক্রমাবনতিতে ভাড়াটেদের বর্ধিত বিক্ষোভ আন্দোলনকে রুখতে গোলাবারুদের উৎপাদনও বেড়েই চলেছে। কাজেই বটগাছ মারার জন্য অ্যাসিড মিলছে না।

নিদারুণ বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ছে বাড়ি জুড়ে। দারিদ্র্যের প্রবল আক্রমণে সব ন্যায়নীতি বোধ উবে যাচ্ছে। অসামাজিক দুর্বৃত্তরা যেখানে সেখানে চুরি, ছিনতাই, খুন-জখম করে বেড়াচ্ছে। পুবের বারান্দায় একটি কিশোরীর উপর পাশবিক অত্যাচার করায় মেয়েটির মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়েছে। দুরাচার রোধে পাহারাদারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকেজো প্রমাণিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাহারাদারদের একাংশও দুর্বৃত্তদের সহযোগিতা করছে গোপনে।

মালিকপক্ষ অবস্থা দেখে নতুন আইন তৈরি করেছে। বিনা বিচারে আটক রাখার আইন। অনাচার-দুরাচার বন্ধ করার জন্য এটা খুবই প্রয়োজন

ভেবে সরলমতি গৃহবাসীরাও অনেকে উৎফুল্ল হয়ে তাদের সমর্থন করেছে। ওদের আসল মতলব ধরতে পারেনি। অরাজকতার হাত থেকে নিস্তার পাবার একমাত্র উপায় হল পুরনো বাড়িটাকে ভেঙে ফেলা। ভেঙে ফেলে আবার নতুন করে গড়া। তাছাড়া কোন বিকল্প নেই। শাল কাঠের খুঁটি লাগিয়ে আর পলেস্তারা চড়িয়ে এই নড়বড়ে ব্যাপারটাকে আর জিইয়ে রাখা সম্ভব নয়। বুদ্ধিমান তরুণরা তাই আওয়াজ তুলেছিল: ভেঙে ফ্যালো! গুঁড়িয়ে ফ্যালো! সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল মালিকপক্ষ। বিনা বিচারে আটক রাখার আইনটা আসলে বিদ্রোহীদের কণ্ঠরোধ করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। অরাজকতাকে উপলক্ষ্য করা হয়েছে যাতে মূল দাবী দাওয়া ধামা চাপা দেওয়া যায়।

অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। হঠাৎ রাত এগারোটায় দরজা ধাক্কাধাক্কির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে দেখি পাশের ঘরের ভাড়াটেদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে বন্দুকধারী পাহারাদাররা। স্বামীস্ত্রী দু'জনকেই। শুনতে পেলাম ওরা আইন ভঙ্গ করেছে। নতুন আইন বলে রাত দশটার পর আলো জ্বালানো নিষেধ। অপরাধ ওদের আরো গুরুতর কারণ, ওরা ফিসফিস করে কানেকানে কথা বলছিল। নতুন আইন অনুযায়ী এটা ষড়যন্ত্র—গৃহদ্রোহিতা।

অতএব—অ্যারেস্ট!

কী অবিচার! এক মাসও পেরোয়নি ওদের বিয়ে হয়েছে। স্বামী স্ত্রীতে দু'টো কথা বলবে রাত্তিরে সেটাও অন্যায়!

ওপাশের ছ'শো চার নম্বরের ঘরের ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন, মুচকি হেসে আবার প্রস্থান করলেন। মনে পড়ে গেল, বিবাহ অনুষ্ঠানে ওরা ওনাকে নিমন্ত্রণ করেনি। তাই উনি আজ খুব খুশী।

ছ'শো কুড়ি নম্বরের গিন্নীর উল্লাস তো আরোই স্পষ্ট। এই নতুন বৌ-ই যে ওনার দরজার পাশে আনাজের খোসা আর ডিমের খোলা ফেলেছিল সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি খুশি মনে রাত্রিযাপন করতে চলে গেলেন।

অন্যান্য ভাড়াটেদের অনেকেই দরজার পাল্লা পুরো খোলেনি। একটু ফাঁক করে দেখেছে ব্যাপারটা, তারপরেই আবার বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রতিবাদ করার মতো কেউ নেই নাকি! বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রেমালাপ

বন্ধ করার জন্যও যখন কালাকানুন ব্যবহার হচ্ছে, কেউ কি দরজা বন্ধ করে রেহাই পাবে।

হঠাৎ পায়ের শব্দ পেলাম সিঁড়িতে। দুটো ছেলে আপাদমস্তক চাদরে ঢেকে লাফাতে লাফাতে নেমে গেল। বুঝেছি। নিচের তলায় যাচ্ছে। মালী আর মিস্ত্রীদের খবর দিতে। বিপদে আপদে ওরাই তো সম্বল। ওরা আমাদের মতো এরকম দূরে দূরে বাস করে না। আমরা দূরে দূরে বাস করি বলেই তো শত্রু মাঝরাতে আমাদের ঘরে হানা দিয়ে এক-একজনকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারে।

সাইরেনের বিকট চিৎকারে সকালে ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল আওয়াজটা ছাতের ওপর থেকে আসছে।

ছাতে উঠে চক্ষুস্থির। এত কাণ্ড হয়েছে কোনো খবরই পাইনি। আকাশ প্রদীপের জায়গাটায় একটা বিরাট লালবাতি বসানো হয়েছে। ছাতের চারকোণে চারটে সাইরেন যন্ত্র আর ঠিক মাঝখানে পেল্লাই এক কামান। ব্যাপারটা কি? একজনকে বলতে শুনলাম, এখন থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় সাইরেন বাজবে। লাল বাতি দপদপ করবে রাত্তিরে।

কিন্তু কেন?

আরেকজন বলল, জানেন না, পাহারাদারের সংখ্যা দু'গুণ করা হচ্ছে। সেই জন্যেই তো নতুন ট্যাক্স বসবে।

তবু বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ গর্জে উঠল কামান। থরথর করে কেঁপে উঠল বাড়িটা। শিশুরা ভয়ে কেঁদে উঠল। মায়েরা ছুটল নিরাপদে আশ্রয়ে আর একটি অতি কোমল কণ্ঠ মাইক মারফত গমগম করে ঘোষণা করল: আপনাদের ভীত হবার কারণ নেই। আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন। আমাদের বাড়ির ভেতরকার গোলযোগের সুযোগ নিয়ে বাইরের দস্যুরা তৎপর হয়ে উঠেছে। বাড়ি আজ বিপন্ন। এই পরিস্থিতিতে সৎ গৃহবাসীর বিভেদ ভোলা উচিত, উচিত দুঃখ-দুর্দশা তুচ্ছ করা। জান প্রাণ কবুল করুন দস্যুদের প্রতিহত করার জন্য। বাড়ির কারণে নিজেদের আপনারা উৎসর্গ করুন! বাইরের সমস্যা ঠেকাতে হলে ঘরের সমস্যা ভুলতে হবে।

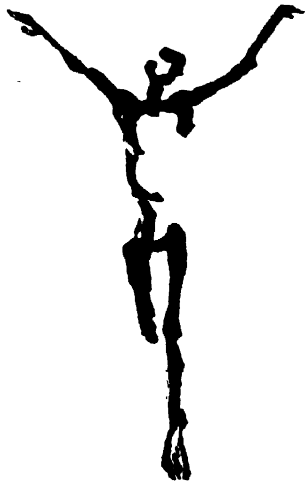
আমার পাশের জন চাপা গলায় বলল, 'এই প'ড়ো বাড়িটার ওপর আবার কোন্ দস্যুর দৃষ্টি পড়তে পারে!'

ভিক্ষাযাত্রার পথটার দৈর্ঘ্য বাড়ছিল না অথচ নিত্যদিন দীর্ঘতর হয়ে উঠছিল। আজ সেটা অফুরন্ত প্রমাণিত হল। চোখের সামনে হঠাৎ রঙের হিজিবিজি, মাথার আনাচে-কানাচে নাগরদোলার চরকি। সিমেন্ট-লেপা কর্কশ ফুটপাথের বুকে মুখ গুঁজে আশ্রয় চাইল নিরাপদ।

শিশু শাগরেদ চিৎকার জোড়ে, 'বাবা গো—' বাপের উপুড় খাওয়া শরীরটাকে দু'হাতে ঝাঁকানি দিতে দিতে নাগাড়ে বলে চলে, 'বাবা, ও বাবা, কি হল ? বাবা গো !'

কালু গলা ফাটিয়ে চেল্লায়। বাপ চোখ খুলছে না। রাস্তার লোকও মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। মা-কালীর থানে মা-কে দেখেছিল একবার. এমনি উপুড় হয়ে ধন্না দিতে। কিন্তু বাবা তো আর···কালু হতভম্ব হয়ে হাতের প্যাঁচড়াগুলো ঘ্যাসঘ্যাস করে চুলকোয়। এমনটি আর কক্‌কনো হয়নি।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কালু। বাপের পিঠে কান চেপে ধরে। হ্যাঁ, ধুক্‌পুক্ করছে বুকটা। মুখ তুলে এদিক ওদিক বার দুই এলোপাথারি চোখ বুলিয়ে তারপর সোজা হাত চালিয়ে দেয় কোমরে। গেঁজ থেকে পয়সার থলিটা টেনে বার করতে গিয়েই মনে হল—রামথাপ্পড়টা এই এল বুঝি !



ধোঁকা

তেমন কিছুই ঘটল না। থলিটাকে হাতের মুঠোয় চেপে আরেক পলক দেখল বাপকে। নিশ্চয় ভিরমি লেগেছে। ভাবনায় সময় খরচ না করে দৌড় জুড়ল কালু।

কিছুদিন যাবৎ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল নিরাপদর দেহের অস্থিসংস্থান। দেহাবরণের বারণ অমান্য করে তার বুকের ওপর হাড়-পাঁজরার নকশাটাই প্রথমে স্বচ্ছ হতে শুরু করেছিল। কিন্তু সময়টাতে তখন ঠাণ্ডার স্পর্শ লেগেছে। ওদিকে নিরাপদর বাসস্থানের মাথায় জবরদস্ত একখানা ছাউনি থাকা সত্ত্বেও সেটা ইস্টিশান। রেলগাড়ি ঢোকার জায়গাটা বয়ে হুশহাশ করে ঢুকে পড়ে কন্‌কনে হাওয়া, ফলে অঙ্গে তার ন্যাকড়া জোবড়া থাকত মেলাই। নিদারুণ খাদ্যাভাবে সপরিবারে 'স্বেচ্ছায়' বাস্তত্যাগ করা ইস্তক গত তিনমাস তাই বেমালুম থাকার সুযোগ পেয়েছিল নিরাপদর ব্যাধি বিপদ।

কালু ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে।

ডিমপট্টির খড় ছাওয়া চত্তরটা পেরিয়ে গলি।

গলি ছেড়ে ট্রামরাস্তা।

দু'ধারের দৃশ্যপট কালুর ছুটের সঙ্গে তাল রেখে পাল্টাচ্ছে।

রাস্তার দু'পারে কাঁচা বাজারের ঢেউ উঠতেই, কালুর ছোটার গতি মন্থর হয়ে এল। চেনা মানুষের সন্ধানে চোখ দু'টো টহল মারে। ফুটপাথের কানাচে হঠাৎ থমকে যায় দৃষ্টি।

'ঝণ্টে দা—ঝণ্টে দা—', চিৎকারটা ছুটে আসে।

'কিরে ছুঁচো!'

বিগত শতাব্দীর অশ্ববাহন কলকাতার স্মারক ঘোড়া জলপানের লোহার ট্যাঙ্কের কানায় বসে ঝণ্টে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে তাকাল।

'বাবা পড়ে গেচে গ'...' বুকে হাপর চলছে কালুর।

'পড়ে গেছে কিরে?'

'হ্যাঁ গ', পড়ে গেচে পতের পরে। কিচুতে উঠতিচে না।' কালুর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসে। ঝণ্টেদার ভাবসাব দেখে ওঠার ইচ্ছে ধরা পড়ে না।

'সে কিরে শালা, বুড়োর আবার হ'লটা কি?' আরো বার দু'য়েক বিড়িটায় টান মেরে সেটাকে ঠিকরে দিয়ে ঝণ্টে খাড়া হল।

'চল্‌—দেখি আবার কি হ'ল!' লুঙ্গিটাকে খিমচে এক বিঘৎ তুলে ধরেছে। 'আবে এই ভোলা! চল্‌!'

'কোথায় গুরু ?'

'চল্‌না বে।'

কালুর মনে পড়ে যায় বাবা বলেছিল, খবোদ্দার,—ঝণ্টের ধারে কাছে যেতে দেখি তো! এক নম্বর চিটিংবাজ নাকি ঝণ্টু।

ঝণ্টেদা একবার বাবার পয়সা মেরে দিয়েছিল।

নাগাড়ে জলের ঝাপটা মারতে মারতে জ্ঞান ফিরে এল। কালু লাফিয়ে উঠল। বাপ চোখ মেলেছে। নিরাপদর কিন্তু ওঠার কোন তাগিদ নেই। পাঁজাকোলা করে নিরাপদকে রিক্সায় তুলে দিয়ে ওরা ইষ্টিশানের দিকে যাত্রা করল।

তেলচিটে বটুয়াটাকে কালু ঝণ্টের নজর থেকে আড়াল করতে পারেনি। জলের ঝাপটা মারার একটা বেসামাল মুহূর্তে পেটফুলো থলিটা দেখে ঝণ্টের চোখজোড়া চকচক করে উঠেছিল। বার কয়েক ওটা চেয়েওছে কালুর কাছে। শুনেও শোনেনি কালু। এমনকি জলের ঝাপটা দেওয়ার কাজটাতেও আর তেমন মন লাগেনি।

শেয়ালদার ফটকটা পার হয়ে ট্রামলাইনের শিরায় রিক্সাটা ঠোক্কর মারতেই নিরাপদ একটা টাল খেয়ে নডবড়ে ঘাড়টাকে হঠাৎ সোজা করে কোমরে ডান হাত রেখে খিঁচিয়ে উঠল, 'এই হারামীর বাচ্চা, পয়সার থলিটে কোতা ?'

ঝণ্টেদার হাত থেকে থলিটা রক্ষা করার গর্বে কালু ছুটে এল। মুঠো করা হাতটা তুলে ধরেছে, 'হেই যে গ', মোর কাচে !'

'মোর কাচে! বাপ চোক্ উলটোলি তো মাব্ ছোঁ! একটুক যদি কম দেকি ত'...'

শাসানির দমক সইতে না পেরে নিরাপদর তলতলে ঘাড়টা আবার ঝটকে পড়ল।

ঝণ্টেকে খোঁচা মারে ভোলা, 'দ্যাখ মাইরি, ঘাটের দিকে পা বাড়িয়েও বুড়োর পয়সার ঝোঁক যায়নি।'

ইষ্টিশান চত্বরে ঢুকেই দৌড় জুড়ল কালু।

'মা—ও মা—বাবা পড়ে গ্যাচে !' দমছুট কালু হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোষণা করে।

'কী! কী বললি ?' ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় কালুর মা।

'হ্যাঁ গ'—রাস্তায় চল্‌তি চল্‌তি, শুকনো ড্যাঙায় দমাস্ করি...'

নিরাপদকে পাঁজাকোলা করে বয়ে এনে কালুর মা-র হেপাজতে ভাঁই করে দিতেই ঘটনার আকস্মিকতায় কালুর মা ছিটকে পড়ে।

'একি হ'লরে ঝণ্টে! কি সর্বোনাশ হ'ল মোদের···ও কালুর বাপ, কালুর বাপ? রা কাড়ে না গ' লোকটা!···'

'ডাকলে চোক চাইতিচে না। কত ডেকেচি।' কালু তার অভিজ্ঞতার কথা জানায়।

হাঁক পাঁক করে স্বামীর গায়ে মাথায় খানিকটা এলোপাতাড়ি হাত চালিয়ে ডুকরে ওঠে। কালুর বাপ তবু কথা বলে না।

'একি হ'লরে ঝণ্টে?' হাউমাউ করে ওঠে সে।

'হবে আমার কি? ভিরমি লেগেছে। মাথায় জল ঝাপটাও, জল। কই, দাও দিকি আট আনা। রিক্সা ভাড়াটা মিটিয়ে দিই।'

ঝণ্টেদার কথা মার কানেই সেঁধোয়নি। বাবার কপালে হাত বুলোতে বুলোতে ডেকেই চলেছে।

'ভ্যালা জ্বালা হ'ল মাইরি। রিক্সাভাড়াটা দিয়ে তারপর কাঁউমাঁউ করোনা। ও মাসী!'

'আমার কাচে যে কানাকড়িটা নেই রে ঝণ্টে। যা থাকে তো কালুর বাপের কাচে।'

কালু একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল। মায়ের কথা শুনেই এক পা পিছিয়ে গেল। ঝণ্টেদা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। রিক্সা ভাড়ার নাম করে থলিটা হাতিয়ে নিতে পারে। আরো এক পা পিছিয়ে এল কালু।

'দ্যাখ্ রে দ্যাখ্ ছুঁচোর বাচ্চাকে। বাপ ধুঁকছে আর হারামীটা পয়সা সামলাচ্ছে।'

কালুর মা মুখ ফিরিয়ে বললে, 'পয়সা থাকে তো দে' দেনা কালু!'

মুখের কথা না ফুরোতেই ভোলা এক লাফ মেরে কালুর ঘাড় টিপে হাত থেকে পয়সার থলিটা নিঙড়ে বার করে নিল। লাফে ঝাঁপে আঁচড়ে কালু যখন ক্ষিপ্ত জন্তু তারই মধ্যে ভোলা ঝণ্টে মানকের হাত ফিরে থলিটা ঝনাৎ করে আছড়ে পড়ল কালুর মায়ের কোলের পাসটাতে।

'হ্যাই কালু!' ধমকে ওঠার চেষ্টা করে কালুর মা।

'দেখে রাখো মাসী ভাল করে। এই আট আনা শুধু নিয়েছি। পরে শালা দুষবে পয়সা ঝেড়েছি বলে। আয় রে ভোলা···'

কালু পিছন থেকে চিৎকার করে, 'ইহ্—ভাড়া কত দিবে!' মায়ের ওপর রাগ ধরে। বাবা জেগে থাকলে মুরোদ ছিল না ঝণ্টে সদ্দারের!

গাছের মূল শিকড়টাতে পোকা লাগলে আসমান ঝাঁজরা করে জল ঝরালেও তার আর পুষ্টি হয়না। নিরাপদ দিন দিন শুকোতে লাগল। এক অফুরন্ত আচ্ছন্নতা, যে নড়েনা বসেনা, শুধু কালেভদ্রে চোখের পাতা তুলে চায়। কালু বার বার ফিরে ফিরে আসে। বাপের কাছে ঘেঁষতে ছ্যাঁকছ্যাঁক করে গা-টা। কয়লাগাড়ির ধোঁয়ার মতো উস্কোখুস্কো চুল, গনগনে চোখ—শিবরাত্রির যাত্রায় দেখা লেঠেলটাকে মনে পড়ে। শুধু গতরটায় কিছু প্যাঙলা।

কালুর মাকে দৃষ্টির আওতায় পেলেই নিরাপদ বলে, 'চল্ বৌ, ঘরে ফিরে চল্।'

কালুর মা আশ্বাস দেয়, নিরাপদর শরীরটা একটু সামলে উঠলেই গাঁয়ে ফিরে যাবে।

বাবার যত কথা মার সঙ্গে। তাতে অবশ্য কালুর কিছু যায় আসেনা। ফ্যাচাঙটা হয়েছে, রোজ সকাল হতে মনটা হাঁক পাঁক করে। বাবুদের হাঁটু ঘিরে ডাকাডাকি নাচাকোদা বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মা কিছুতেই যেতে দেবেনা। এখন আবার নতুন কাজ জুটেছে। দিনে তিনবার কব্‌রেজ বুড়োর কাছে ছোটা। যাতায়াতের পথে পাঁচ দশ পয়সা কামাই। কাঁচের চোখওলা কব্‌রেজ বুড়োকে ভয়ভয় করে। একবার জিগ্যেস করেছিল, বাবা কবে সেরে উঠবে। অমনি চোখ পাকিয়ে বুড়ো যে হাঁক্ পাড়ল যেন বজ্জরপাত্।

ওষুধের শিশি মার হাতে দিয়ে কালু জানিয়ে দেয় রোজ সাত আটবার করে পেটে মালিশ করতে বলেছে।

ত্রিকালদর্শী কব্‌রেজের সব্‌জে তেল পরম শ্রদ্ধা ভরে হাতের চেটোয় ঢেলে নেয় কালুর মা।

মা মালিশ শুরু করে। কালু ডাংগুলি পেটাতে যায়।

মালিশ করতে বসলেই কালুর মা-র দেহ যেন হিম মেরে আসে। বুকের খাঁচাটা পেটের হোতা শেষ হবার পর যেন আর কিছুটি নেই। দৃষ্টি না রাখলে ধাঁধাঁ লাগে হাতটা দেহে বোলাচ্ছে না মাটিতে। তারই মধ্যে থেকে থেকে সারা শরীরটায় খিঁচ ধরে। শ্মশানঘাটে রাতের বেলা ভূত দেখার মতো আতঙ্কে ড্যাবড্যাব করে নিরাপদর চোখ, তবু মুখ দিয়ে শব্দ সরেনা। তারপর শরীরটা

ব্যথার কামড় থেকে নিস্তার পেলে চোখ দু'টো বুজে আসে। ডাঙায় তোলা জ্যান্ত কাতলা মাছের মতো হাওয়া গিলতে গিলতে বলে, 'মুই বাঁচবুনি রে আর! মোকে দেশে নে' চল।'

নিরাপদর মুখের সঙ্গে কানটাকে ঠেসিয়ে শুনতে হয় কি বলছে।

যত অলুক্ষুণে কথা। ভুরু কুঁচকে যায় কালুর মা-র।

নিরাপদ একই কথা বলে চলেছে ক'দিন ধরে। তবু মানুষটার ওই হাওয়া ভরা স্বরটার একটা রহস্যময় আকর্ষণ।

'চুনিয়া নদীর পারে হাড় ক'খান চিতেয় তো দিতি পারবি। বাপটাকে নিজহাতে ওই হোতায় ভাসান তো দিইচি। আমার নে' চল তুই—দোহাই বৌ, হেতায় মোর মুকে কেউ নুড়ো জ্বালবে নি কো।'

'চুপ যাও, চুপ যাও কালুর বাপ।'

'দেকিসনি বৌ, সাদা চটে সাপটে লাশগুলোকে কাঁড়ি করি রাকে ইষ্টিশানের বাইরে গ্যাটে।' নিরাপদ আবার হাঁ করে বাতাসে শ্বাস খোঁজে।

কবরেজের সবজে তেল, ঠাকুর দেব্‌তার ছাইভস্ম ফুলের ছোঁয়া অগ্রাহ্য করে নিরাপদ দিন দিন লোপাট হতে থাকে। কালুর মা ইতিমধ্যে তলপেটে একটা গোলগাল ফোঁড়ার ডেলা আবিষ্কার করেছে। আর কালু আবিষ্কার করেছে ভিক্ষে না করেও খ্যাটন মোটে খারাপ হচ্ছে না। চত্বরের সব হারামীগুলো ভালো মানুষ বনে গেছে। সবাই কিছু না কিছু দিয়ে থুয়ে যায়। মায়ের সাথে গুজুর ফুসুর চলে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবাকে আঁচ করে। ঝণ্টেদা অবধি রোজ আসে খপর নিতে। মনটা উদাস করে। কিন্তু মোল্লাজান বলেছেন রঙীন জামা দিবে। কত বড় দুকান মোল্লাজানের। মোল্লাজানের হাতের দড়িতে কত ছেলেমেয়ে গতরের মাপ দে' যায়। বাবা না উঠলে জামাটাও জুটবেনা।

ছ' দিনের দিন সাত-সকালে ঘড়ঘড় শব্দে চমকে ঘুম ভেঙে গেল কালুর মা-র। নিরাপদর চোখ-খোলা, মুখ হাঁ। পেটের ওপর থেকে চাদরটা সরানো। দু'হাত খিমচে আছে পেটের চামড়াটা। ফোঁড়া নয় তো এক রাক্কুসে ঢিবি। কসের দু'ধারে দুধ ওথলানো সাদা ফেনার বুড়বুড়ি।

মায়ের কান্নার চাবুকের ঘায়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কালু। আশপাশের অনেকেই মাথা ঘুরিয়ে ঘুম জড়ানো চোখে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। আড়মুড়ি ভেঙে উঠে এল কয়েকজন। শুরু হয়ে গেল তেলমালিশ, দেবতার ফুলের

ছোঁয়া, জলের ঝাপটা। হরেক জনের হরেক উপদেশের কোনটাই ফেলেনি কালুর মা। ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চলেছে। ফেনারা তবু ওথলায়।

কালুর হাত ধরে মা ওকে টেনে বসিয়ে দিয়েছে বাপের পাশে। হতভম্ব হয়ে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে বাপের পেটে হাত রেখেই চমকে গেল কালু। মাকে ডেকে দেখাল কোঁড়াটা কেমন চুপসে যাচ্ছে।

'মা—মাগো—দয়াময়ী,' মা সর্বমঙ্গলার কৃপা প্রার্থনা মুখে নিয়েই বসে পড়ল কালুর মা।

মুখটা হা করে একটা বিরাট হেঁচকি তুলল নিরাপদ। শরীরটা ধনুকের মত ভোঙ্গা হয়ে মুখ দিয়ে এক ডেলা রক্তের তীর নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভেদের সাফল্যে নিশ্চিন্তে শিথিল হয়ে গেল।

হেঁচকি তোলার মুহূর্তে কি যেন বলেওছিল, কিন্তু রক্তের ডেলাটা জিভে জড়িয়ে গিয়ে শব্দগুলোকে চুবিয়ে দিয়েছিল। অর্থভেদ করা সম্ভব হয়নি। রক্তের ডেলা ফেটে ভাসাভাসি, পেটের কোঁড়াটার বেবাক মিলিয়ে যাওয়া, শরীরের আস্ফালন—এতগুলো ঘটনা একসঙ্গে! যেন ভোজবাজি। সবাই থ'।

'যত হাঁ-করাগুলোকে দেখ একবার। লোকটা টেঁসে গেল মুখে একটু জল ছেটারে—' ঝন্টের গলাতেই প্রথম স্পষ্ট ঘোষণা এল।

কালু ভাবে কয়লা কুড়োতে গিয়ে ভুলোটা যখন কাটা পড়ল কত রক্ত। 'কিন্তু তত রক্ত কি বেইরেছে বাবার মুখ থেকে? তবে বললেক কেন টেঁসে গেছে?' কালু নিশ্চিত হতে পারে না প্রথমটা, তারপর ভাবে, বাবার রোগা শরীরে রক্ত কম ছিল।

কালুর মা আকুল কান্না নিয়ে জাপটে ধরে ঝন্টুর হাত, 'ও বাবা ঝন্টে। আমি কিছু চাইনাকো বাবা। ওর শেষ গতিটা করে দে'রে তুই। কুটোটি নেইকো মোর কাছে…'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, সব হয়ে যাবে! আমরা এতগুলো দামড়া রয়েছি, ভয় কি মাসী। দুজনে কাঁধে বয়ে সটান ফেলে দিয়ে আসব লাইনে।'

'না—আ—' মা-র আর্তনাদে চমকে যায় কালু। মা এখন মুখে হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঝন্টেদার নিশ্চয় কোন ফিকির আছে। মা বুঝতে পেরে গেছে তাই—

'এই তো! মেয়েছেলেদের যত হ্যাপা। এই বেলা লাইনে ফেলে এলে

লোকালে কাটা পড়বে। রেলকম্পানি সব হিল্লে করে দেবে।' ঝণ্টে বৃথাই বোঝাবার চেষ্টা করে।

'না না—আমার পেরান থাকতে পারবনি। এমন কতা বলিস্ না বাবা ঝণ্টে। মরার কালে বলে গেচে দেশে নে' চ'। দেশে নে' চ'। মুয়ে আগুন পড়বেক না, দাহ হবেক না—এই ভয়ে যেন কাঁটা হয়ে ছেল। যা হয় গতি একটা করে দে' বাবা আমার। তোর পায়ে পড়ি…'

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও! আচ্ছা ঝামেলা বাঁধালে দেখি। ঠিক আছে। ভোলা হারুকে তো আগে ডাকি…সাত সকালে যত উটকো ঝামেলা…'

গজগজ করতে করতে চলে গেল ঝণ্টে। মা আপন মনে বকে। উপায় থাকলে কি আর কেউ ভিটে ছাড়া হয়ে পড়ে থাকে। মাঠে গিয়ে দাঁড়াতে হবে যে। ঘরের দেয়াল কখান দাঁড়িয়ে আছে দেখে এসেছিল, এদ্দিনে কি তাও আর আছে!

অদৃশ্য শ্রোতাকে খাড়া করে গল্প ফেঁদেছে কালুর মা। সেই কবে কনে বৌ হয়ে শ্বশুরবাড়িতে পা দিয়েছিল। কালু বুঝতে পারে না মা এতসব বকবক করছে কেন। ওদিকে গাড়ীর চাকায় থ্যাৎলানো কুত্তার গায়ে থিকথিকে মাছির মত ভিড় জমেছে নিরাপদকে ঘিরে।

কারুর কাছে কোন আমল না পেয়ে কালুর চোখ ভরে জল আসে। সবার মুখে শুধু বাবার কথা! সকলে ভুলে গেছে কালুকেই তার বাপ সবচেয়ে ভাল বাসত। মা-র মনে নেই, ভাত ধরে গেছল যেদিন, ঘেঁটি ধরে কেমন মাথাটা ঢিপ করে ঠুকে দিয়েছিল। কালু চড় থাপ্পড় খেয়েছে বাবার কাছে কিন্তু অমন প্যাদানি নয়।

ভোলা ও হারুর মাথায় মড়া-বওয়া খাটিয়া চড়িয়ে ঝণ্টের আবির্ভাব ঘটতেই হই-চই লেগে গেল। 'ওই তো—ওই তো ঝণ্টে—যাই বলো বাপু, বিপদে আপদে ওই ঝণ্টেই করে…'

চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ায় কালু। কালুর মা সবে স্বামীপুত্র সংসার সমেত শেয়ালদায় পা দিয়েছে তখন।

'আরে। মড়াটাকে ফেলে রেখে মজা দেখছে নাকি লোকগুলো, অ্যাঁ?'

ঝণ্টের গলার শব্দে কালুর মা-র বকবকানি থেমে যায়।

'একখানা চাদর-ফাদর দিয়ে ঢেকে দেবে তো লাশটা, নাকি! ঈশ! ছ্যাখ ভোলা, ছ্যাখ একবার—চোখের পাতাগুলো অবধি টেনে নামিয়ে দেয়নি!'

'এগুলোর কারুর ঘরে কি মানুষ মরেনি কোনদিন!' ভোলার সংযোজন।

'রাতের বেলা মড়ার এই ড্যাবড্যাবে চোখ দেখলে ঝান্টু ডোমও ভিরমি খাবে।' হারু হাসে।

'ঠিক কথা বলেছে ঝণ্টেদা, ভোলাদা।' এতক্ষণ কোন আমল না পাওয়ার ঝাল মেটায় কালু মনে মনে। কেউ কোন কাজের নয়!

'নে' নে', তোল দেখি খাটে। ওসব চাদরফাদর আর জুটবেনা।'

হঠাৎ তীরের মত ছুট লাগাল কালু। ও জানে এবার বাবাকে খাটে তুলে হরিবোল বলতে বলতে ছুটবে সবাই। অমন কত দেখেছে। বাবা বলত, 'পেন্নাম কর, কালু, মড়াকে মান্যি করতে হয়!' সবাই তো শুধু আহা উহু করছে কিন্তু মড়াকে যে…

ঝণ্টের কথাতেই বোধ হয় একটা ছেঁড়া থানও যোগাড় হয়ে গেল। শাড়ি গায়ে দিয়ে খাটের উপর শুল নিরাপদ। খাটে শোবার এই তার প্রথম অভিজ্ঞতা।

ঝণ্টে বলল, 'এই ভোলা, একটা দড়িটড়ি নিয়ে আয়তো কিছু।'

'কি হবে?'

'দেখছিস্ না, লাশটা শোলার মত ফঙফঙে। গড়িয়ে পড়ে যেতে পারে। পা-টা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিতে হবে।'

গজগজ করতে করতে ভোলা যোগাড় করে আনল কলার ছালা। নারকোলের দড়ির চেয়ে কম শক্ত হবেনা। নিরাপদর ঠ্যাঙ বেঁধে কাঁধে চড়াতে যাবে, ছুটতে ছুটতে এল কালু। কোথায় যে এতক্ষণ গা ঢাকা দিয়েছিল কেউ খেয়ালই করেনি। কালই রাত্রে কনে বৌ নিয়ে বরযাত্রীর হল্লা নেমেছিল ইষ্টিশানে। ফেলে যাওয়া বাসী ফুলগুলো ঝাঁট দিয়ে জমা করা ছিল জঞ্জালের গাদায়। ঘেঁটে ঘুটে অনেক ফুল কুড়িয়ে এনেছে কালু দু'হাত ভরে। ঈশ্বরের অপার করুণা। না হ'লে এমন যোগাযোগ ঘটে! নিরাপদ নিজে কোনদিন ভাবতে পেরেছিল তার সপুষ্প অন্তিম যাত্রার কথা।

ফুল সাজাতে সাজাতেই ভয়ে ভয়ে তাকায় কালু ঝণ্টেদার দিকে। এক্ষুনি না তেড়ে আসে দেরী হচ্ছে বলে! ঝণ্টেদা কিছু বলছেনা দেখে সাহস পায়। শুধু ঝণ্টেদা নয়, ভোলা হারু কেউই খেঁকিয়ে ওঠেনি, তাগাদাও লাগায়নি। ফুল সাজানো শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বেদম অবাক হয় কালু। হ'ল কি? মুখে সব কুলুপ! দামড়ী মেয়েগুলো পর্যন্ত আঁচলে মুখ গুঁজে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ

করে কাঁদে কেন! কালুই শেষপর্যন্ত সপ্রতিভ হয়ে উঠল, 'যাবে নি কো? কুল দে' দিইচি ত।'

অফিসযাত্রীদের ভিড় চিরে বীরদর্পে হেঁটে চলে মৃত্যু। কালু ও কালুর মা অনুসরণ করে পিছনে। নিরাপদ এমন কোন চাপ সৃষ্টি করেনি ঝণ্টেদের কাঁধে। ইচ্ছে করলে ওরা চারজন মিলে নিরাপদকে ছুটিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু কালুর মা-র মন্থর গতিকে অবহেলা করতে পারেনা।

বল হরি ধ্বনির মহিমায় যান ও যাত্রীর জঙ্গলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে পথ করে নিয়ে অষ্টপদ শবশকট বৌবাজারের গহন জটিলতা অতিক্রম করে।

কালু চলেছে মায়ের আঁচল ধরে। বারবার দেখছে লোকে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ছে। বাবার দিকে তাকিয়ে কপালে আঙুল ছুঁইয়ে প্রণাম সারছে ভদ্দরলোক বাবুরা।

মৌলালির মোড়ে ট্রাম লাইনের ধারে একছিলে ফাঁকা জায়গাটার ওপর খাটিয়া নামানো হল। কালু ও কালুর মা-কে খাটিয়ার পা ছুঁয়ে মুখোমুখি বসিয়ে দিয়েছে। ভোলা হাফপ্যাণ্টের ওপর থেকে গামছাখানা খুলে বিছিয়ে দিল মা-ছেলের মাঝখানে।

'তোমরা বসো এখানে। আমরা একটু ঘুরে আসি।' ঝণ্টে ঘোষণা করল, 'ভয় নেই মাসী, কাটছিনা।'

'কিন্তু বাবা, কতকখন…'

'পয়সাকড়ি তো চাই, নাকি এমনি সব হয়ে যাবে? শ্মশানে কি শ্বশুর-ভাসুর আছে? চল্ বে—'

এক পা বাড়িয়ে আবার পিছন ফিরল ঝণ্টে। 'ভোলা! দু' চারটে নয়া দে' তো। এই হারু দে'না দু' চারটে খুচরো।'

'কি হবে?'

'দে না ব্যাটা। ঝাড় যাবেনা। পয়সায় পয়সা টানে, বুঝলি! গামছায় ক'টা ছড়িয়ে না রাখলে লোকে ছুঁড়বে না।'

গামছায় দু' চারটে পাঁচদশ ছুঁড়ে দিয়েই ধমকে উঠল ঝণ্টে, 'শকুনের মত চাইছে দ্যাখ্। খবর্দার কালু। পয়সায় হাত দিবি তো তাবড়া উড়িয়ে দেবো। মাসী—'

'না বাবা, ও হাত দিবে না।'

'হ্যাঁ, মনে থাকে যেন।'

ঝণ্টের কথা শেষ না হতেই দু'টো পাঁচ নয়াকে উড়িয়ে নিয়ে এল করুণা।

হারু ফিক্ করে হেসে খোঁচা লাগাল ঝণ্টের কোমরে, 'বলো গুরু, আমদানি ভালোই হবে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।' রাস্তায় পা দিয়ে ঝণ্টে বলল।

ঝণ্টে আবার পিছন ফিরে হাঁক ছাড়ল, 'এই ছোঁড়া, যা বললাম মনে থাকে যেন।' তারপর ভোলার দিকে তাকিয়ে, 'জানিস্ না, বাচ্চাটা বহুত বিচ্ছু। পয়সা দেখলে ব্যাটার চোখ জ্বলে।'

গামছার উপর টাপুর টুপুর পয়সা ঝরছে তো ঝরছেই।

'মা! চার আনা গো।' দামী পয়সা পড়লেই কালু জানান দেয়।

বাবার সঙ্গে বেড়িয়ে ভিখ্ মেগে মেগে গলা কাঠ করে পয়সা জুটত। না চাইতে বাবুরা পয়সা দিচ্ছে আজ! কালু মনে মনে আওড়ায়।

বেশ কিছু খুচরো জমতে দুই তিন পাঁচ দশের আলাদা আলাদা গোছ করবে বলে হাত বাড়াতেই ধমক খায়, 'অ্যাই, ঠিক বলেছেল তো ঝণ্টে! বড় নোলা বেড়েচে দেকি।'

থতমত খেয়ে যায় কালু। হাত সরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে, 'বাবাই তো পয়সা গোছ করি দিতি বলতো। পয়সাগুলোন কি ঝণ্টেদার?'

'চোপ্!'

তবু থামেনা কালু, গজগজ করে। পয়সাগুলো নিয়ে ঝণ্টেদা চলে যাবে যখন, বুঝবে—এতগুলো পয়সা—

মা আর বকুনি দেয়না।

কালু বকতে থাকে আপন মনে, নিশ্চয় এখন মাস পয়লা। মাসের শেষে মরলে কিছুতেই এত…

'কি বললি?'

মায়ের চোখে আগুন দেখেই কালু কথা ঘুরিয়ে নেয়, 'মা, বড় খিদে লেগেচে।'

মা কিছু বলার আগেই পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'আহা রে, ভাখো একবার।'

কালু মুখ তুলে চায়। যেন দুগ্গা পিতিমা এসে দাঁড়িয়েছে। গোল লাল টিপ কপালে অচেনা মা ঠাকরুণ কালুর পানেই চেয়ে আছে।

'এইটুকু একটা দুধের বাচ্চা রেখে, ভাবতে পারো ?' দুগ্‌গা ঠাকুর তার পাশে অসুরটার দিকে তাকিয়ে বলল। 'দেখো, বৌটার বয়স কিন্তু বেশী না। লোকটা একেবারে বুড়ো, বুড়ো বয়সে বিয়ে করে—ছিঃ !'

কালু বলতে যাচ্ছিল, 'কে বলেচে মোর বাপ বুড়ো। প্যাটে কোঁড়া হয়েছিল বলেই না…'

দুগ্‌গা ঠাকুরের হাত ধরে অসুর টান লাগাল। 'এই ! ট্রাম আসছে। কলকাতার রাস্তায় করুণা ঢেলে শেষ করতে পারবেনা।'

মা ঠাকরুণ আঙুল নেড়ে ব্যাগ খুলে একটা গোল চাকৃতি বাড়িয়ে ধরল কালুর দিকে, 'এই নে' কিছু কিনে খাস্‌।'

দুগগা ঠাকুরকে নিয়ে ট্রামগাড়ি চলে যাবার পর কালু হাতের মুঠোর দিকে চায়। বাপরে !—একটা আটানি! মায়ের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

'যা না, মোড় হতে মুড়ি বাদাম নে আয়। চোপর দিন খাসনি ক'।'

পেটের জ্বালাটা আবার তিড়িক করে ওঠে। 'ঝণ্টেদা মারবেনি ত' ?'

'কিচ্ছু বলবেনি, পয়সাটা তো তোকেই দেছে।'

কালু উঠে দাঁড়াল। আরেকবার তাকায় গামছাটার দিকে। নাঃ—এতগুলোন পয়সা পেলে ঝণ্টেদা আর রাগ করবেনা। নিশ্চিন্ত হয়ে পা বাড়ায় কালু।

বাঁ হাতে মুড়ির ঠোঙা মুঠো করে মুড়ি চিবোতে চিবোতে হাঁ করে দেখছিল কালু, মাথার ওপর টিনের ছবি হতে একটা মেয়েমানুষ ভট্‌ভটি চড়ে ছুটে বেরিয়ে আসছে।

ছবি থেকে চোখ ফেরাতেই দেখল দু'টো সাহেব বাবু খাটিয়ার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আবার দামী চকচকে চাকতি জোটার লোভে ওর চোখে ঝিলিক খেলে যায়। নিমেষের মধ্যে সাহেববাবুদের পাশে হাজির।

'খামোকা পয়সাটা গচ্চা দিলি।' একজন বলে উঠল। 'এখানে যত দেখবি—সব পেশাদার। ভিক্ষে করাই পেশা।'

'যাঃ—কি আলফাল বকছিস্‌।'—অপর জন।

'অমনি যাঃ হয়ে গেল ! কট্টুকু জানিস্‌ এদের ?' সাহেববাবু সিগারেটের ডগায় আগুন ছুঁইয়ে নিল। 'শোন্‌ তবে—ক'দিন আগেই হাওড়ায় একটা ছেলেকে ধরেছে। দুমদাম্‌ লাফ মারতো ছোঁড়াটা চলতি গাড়ির সামনে।

কোনক্রমে ব্রেকট্রেক হাঁকড়ে যদি বা প্রাণ বাঁচত, চোট্ লেগে যেত মাঝেমধ্যে। আর অমনি—ছোঁড়াটার দলের লোকগুলো ছুটে আসত।'

'তারপর বেমক্কা ঢাঁইটুঁই বাঁচাতে ড্রাইভারকে নিশ্চয়…'

'তাই তো বলছি, সবে কলকাতা এসেছিস্ তো…'

'কিন্তু তুই যাই বলিস্ এরা কখ্খনো পেশাদার ভিখিরি হতে পারে না। নিশ্চয় রিফিউজি…'

'রেখে দে তোর থিওরি। আমি বলছি এগুলো খাঁটি বুজরুক।'

'লোকটা মরে গেছে, তবু বলবি…'

'কি করে বুঝলি লোকটা মরেছে?'

'সেটাতেও সন্দেহ?'

'সন্দেহ নয় ঘটনা। আমি বলছি বুড়োটা মরার ভান করে পড়ে আছে। স্রেফ পয়সা রোজগারের ধান্দা। আস্ত ধাপ্পা।'

কালু প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি। শেষের কথাগুলো কিন্তু…কালু কাছে ঘেঁষে আসে সাহেব বাবুদের। এরা বলছে কি? চক্কর লাগে। সত্যিই তো, কদ্দিন সে বাবার সঙ্গে বেরিয়েছে এতকগুলো পয়সা চোখে দেখেনি কখনো।

'আমি বলছি বুড়োটা জ্যান্ত। মড়ার মতো পড়ে আছে। বিশ্বাস না হয় টেনে একটা ঢিল মার্। দেখবি তিড়িং করে উঠে বসেছে। আমি বলছি তুই মার্—'

'হ্যাঁ, ভালো বুদ্ধি বাতলেছিস্। তারপর সবাই মিলে আমায় চাঁদা করে ধোলাই লাগাক!'

'তা যা বলেছিস। আশেপাশে এদের সাঙ্গপাঙ্গ কি আর নেই?'

'চল্ চল্—এস্ ফোর্টিন্!'

সাহেববাবুরা চলে যেতেই কালু মুড়ির টোঙাটা টপ্ করে মায়ের কোলে ফেলে খাটিয়ার পাশে গিয়ে মুখ নিচু করে বাবার মুখের দিকে তাকাল। হক্ কতা কয়েচে বাবুরা। ওইতো বাপ বুড়োর চোখ দুটো জ্বলছে। চেয়ে দেখছে নিশ্চয়।

কালু ঠেলা লাগাল বাবাকে—'বাবা! বাবা!' কালু ফিসফিস করে ডাকছে যাতে আর কেউ শুনতে না পায়!

মা-র ভুরু কুঁচকে যায়, 'এই কালু! আয়, ইদিকে চোলে আয়!' মা ডাকে।

কালু সরে না। বাবা সাড়া দিচ্ছেনা। আরো কামাতে চায় নিশ্চয়। কিন্তু সেকথা কালুকে বলতে তো কোনো দোষ ছিলনা। ও কি কাউকে খবর দিত? এত বোকা কি কালু! শেষ পর্যন্ত ঝন্টেদা এত আপন হল আর কালু কেউ নয়। কি দরকার ছিল সকাল থেকে পেটের জ্বালায় এমন জ্বালিয়ে মারার।

'ও বাবা! বাবা!' অস্ফুটস্বরে ফের ডাকে কালু, তবু সাড়া পায়না। উথলে ওঠে অভিমান আর রাগ। গলা ধরে আসে, 'মোকেও ধোঁকা দিবে! আচ্ছা—'

একতাল রাগ আর ফোঁপানি ছুটে আসে ট্রামলাইনের কিনারায়। পাঁচিলের পাশে জমা রয়েছে ইঁটপাথরের টুকরো, সুরকির স্তূপ। এ তল্লাটের সাধারণ প্রস্রাবাগার। ঠাণ্ডা ঝাঁঝালো খণ্ডবস্তুগুলো দু' হাতে মুঠো করে খিমচে নেয় কালু। ঘুরে দাঁড়ায়।

শন্‌শন্ ঢিল ছোটে খাটিয়ার দিকে। একটা কপালে, একটা মুখে—

'তবু সাড়া দেবেনি!' আবার নিচু হয় কালু।

রাগের মাপে ঢিলে কুলোয় না। এবার আধলা। কালু দেখতে চায় তার বাপ্ আর কত ঢঙ ক'রে পড়ে থাকে। কেন, কেন সে ধোঁকা দেবে কালুকে!

ঢিলের গোলা দেগে ধোঁকাটাকে চুরমার করার সুযোগ পেলনা কালু। ওকে নিরস্ত করতে সবাই হামড়ে পড়তেই থমকে গিয়ে দু'পা পিছিয়ে এল। তারপরেই ছুট।

ধরা ও দেবে না। এরা সবাই মিলে ওকে ধোঁকা দিয়েছে।

# ডারউইনের ডায়েরি

ডারউইনের ডায়েরি[1] : অশোককুমার দত্ত

১ম পাতা

এইচ্ এম্ এস্ বিগ্‌ল্[2] এইচ্ এম্ এস্ বিগ্‌ল্। এসে গেছে। কি সুন্দর জাহাজ। কালো কুচকুচ করছে, ঠিক যেন পাতি কাকের পা। পিছনে দু' জোড়া চাকা, সামনে এক জোড়া। হেড্‌লাইট দুটোর কী জ্যোতি! রাত্তিরেও মাঝ-সমুদ্দুরে পথ হারাবার ভয় নেই। ঠিক সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে।

ভোঁওপ্—ভোঁওপ্—ভোঁপ্—

জাহাজ হর্ন দিচ্ছে। ওঠবার সময় হয়েছে। চলো বাবা চলো—শুভযাত্রা! শুভযাত্রা!

তাহলে ডারউইনের যাত্রা শুরু হল। কী খুশি আমি।

এটা স্মরণীয় ১৮৩১-এর[3] ২৭শে ডিসেম্বর।

তমসাচ্ছন্ন জলভাগ হাতছানি দিচ্ছে। কয়েকটি তারা আর গোটা তিনেক কুত্তা আমাদের সী-অফ্ করছে। শুভযাত্রার প্রারম্ভে শঙ্খধ্বনি হল না কেন? না না, আমি জানি, চোখে দেখতে না পেলেও বাদলরা নিশ্চয় আশেপাশেই কোথাও আছে।

১ ১/৮ ক্রাউন-সাইজের রুল-টানা নোটবইটির প্রথম পাতায় এই নামকরণ ডায়েরির লেখক অশোককুমার দত্ত-র।

২ ডারউইন এই জাহাজটিতে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণে বের হয়েছিলেন অবৈতনিক প্রকৃতিবিদ হিসাবে।

৩ ১৮৩১-এর ২৭শে ডিসেম্বর ডারউইন বিগ্‌ল্ জাহাজে চড়ে পাড়ি জোড়েন আর অশোককুমার দত্ত গ্রেপ্তার হন ১৯৭১-এ।

—বাদল, শ্যামল, তপু—আমি চললাম রে! বিগ্‌ল্‌ এসে গেছে।

একী! নাবিকরা ছুটে আসছে কেন? হাতে ডাণ্ডা নিয়ে?…চিৎকার করেছি বলে? নিশ্চয় ওরা অভিযান সম্বন্ধে গোপনীয়তা রক্ষা করতে চায়। কিন্তু না-জানিয়ে অভিযানে বেরনো কি ঠিক! আহ্—মারল—ওরা আমাকে মারল—

২য় পাতা

গ্যালাপাগোস আইল্যাণ্ড[১]! অবশেষে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ!

না না, আমার কোন ক্ষেদ নেই। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ যাত্রাপথে, নরখাদক পিশাচদের হাতে আমার বাঁ চোখটা গেছে। ডান পা-টা হাঁটু অবধি কাটা। দু' হাতের দশটা আঙুলের মধ্যে একটাতেও নোখ নেই। ওরা বাব্‌লা পিন্ ফুটিয়ে এক-এক ক'রে উল্টে দিয়েছে নোখগুলো। ডান হাত দিয়ে কিছু মুঠো করে ধরতে পারি না। নাকটা এখন মুষ্টিযোদ্ধাদের কথা মনে করিয়ে দেয়—হাড়গুলো চুরচুর। দেখে জন্মসূত্রে বিকলাঙ্গ বলে ভুল করাই স্বাভাবিক। আমার শরীরের ক্ষতগুলোই প্রমাণ করছে নির্ভীক না হলে যুগান্তকারী আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করা যায় না।

এখন শুধু পর্যবেক্ষণ। শুধু চেয়ে দেখা চোখ ভরে। তথ্য সংগ্রহ। পুরো দ্বীপটিকে ঘিরে ধাতবকণ্টকলতা শোভিত ইটের প্রাচীর। অর্ণবপোত প্রবেশের একটি মাত্র লৌহ-দুয়ার। গম্বুজে গম্বুজে শিকারী আলোর প্রহরা।

পেয়েছি! দেখা পেয়েছি! আমাকে যে-পাখি বিখ্যাত করবে সেই ফিঞ্চ পাখির দেখা পেয়েছি। যদিও এরা এখন দু' পেয়ে জীব, স্তন্যপ্রাণী প্রাণীতে পরিণত হয়েছে।

অভিব্যক্তিবাদের প্রথম চিন্তা ব্যক্ত করতেই প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছি। স্বাভাবিক। খুব স্বাভাবিক। সমস্ত প্রচলিত ধ্যানধারণা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে যে! স্থিতস্বার্থের রক্ষকরা এখন তাই উন্মাদ হয়ে উঠেছে। মহামান্য পোপ্ স্বয়ং আমাকে শাসিয়েছিল। রক্ষকের বেশধারী ভক্ষক আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য উকিল নিতে উপদেশ দিয়েছে। নেব না। কেন নেব? গায়ের জোরে বললেই কি মিথ্যেটা সত্যি হয়ে যাবে! পৃথিবীটা

১ এই দ্বীপটিতে ফিঞ্চ পাখিদের চঞ্চুর আকৃতি বৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে ডারউইন অভিব্যক্তিবাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটি সূত্র লাভ করেন।

ওরা বলছে, সৃষ্টির আদি থেকেই নাকি এই রকম, এই এখনকার মতোই ছিল। চিরকাল থাকবেও নাকি এই রকম—অপরিবর্তিত। কী আহ্লাদের কথা! উত্তরসূরিরাই বিচার করবে, আমার চিন্তাধারা নির্ভুল কি না।

৩য় পাতা

এক—দুই—তিন। সামনে।

তিন—দুই—এক। পিছনে।

এক—দুই। ডান দিকে।

দুই—এক। বাঁ-দিকে।

তার মানে মাত্র তিন-পা বাই দু-পা জায়গা আমার গবেষণাগারে।

চণ্ডা—চণ্ড—

দরজা খুলে ঢুকছে। খাবার দেবে বোধহয়। না!—একি? হাতে একটা ছবি কেন?

—এটা কার ছবি তোমার হাতে?

—ইনি ঈশ্বর। প্রণাম কর্!

—ঈশ্বর! সে কে?

—যিনি তোকে, আমাকে, সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। প্রণাম কর্ এক্ষুণি!

—কক্ষনো না। এই ছবি টাঙিয়ে তোমরা আমার গবেষণাগারের শূন্যতা নষ্ট করবে না। ছবিটা টাঙানো মানে ছবির আয়তনের সমান বাতাস বিচলিত করা। বাতাসে আছে প্রাণদাতা অক্সিজেন।

—ঈশ্বরকে ভক্তি করতে শেখ্! তিনি না থাকলে আমরা ধরাধামে আসতে পারতাম না।

—ঈশ্বরকে ভক্তি করবার জন্য অ্যামিবা জেলিফিশ-রা আছে।

—চোপরাও বেয়াদপ!

—চোপরাও অবৈজ্ঞানিক!

ঈশ্বরের ছবিটা জোর করে টাঙিয়ে দিয়ে চলে গেছে বদমাইশদের বেতনভুক্‌টা। আমিও পাজামার দড়ি খুলে সেটা দিয়ে এবার ঈশ্বরের লেজ বানিয়ে দেব।

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই জীবজগতের অভিব্যক্তি ঘটেছে। প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বর নেই—এবং যে নেই সে কিছু সৃষ্টি করতে পারে না।

সারাদিন শুধু এই কথাই চিৎকার করে প্রচার করেছি। কেউ কান দেয়নি। কিন্তু সে আর ক'দিন।

ইউরেকা! ইউরেকা! উদাহরণ পেয়ে গেছি। ঠিক যা খুঁজছিলাম।

একটি নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হতে চলেছে। হ্যাঁ—তার সব লক্ষণই ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে দেখছি। খুব স্পষ্ট। পরিবেশগত চাপ এদের ওপর খুব বেশী। জীবিকা অর্জন ও পুরস্কৃত হবার লোভই সেই পরিবেশগত চাপ।

হাঃ হাঃ হাঃ—মূখ্য মূর্খ! পরিবেশগত চাপ প্রজাতির বিশেষ কোন গোত্রের অভিব্যক্তি ত্বরান্বিত করে না? বলছ কি? বই পড়ো, বই পড়ো। ইংল্যাণ্ডের সাদা মথ আর কালো মথদের খবর জানো না?[১] যন্ত্রযুগের আগমনের পর সাদা মথগুলো কালো হয়ে গেছে। কেন? কেন আবার কি, পরিবেশগত চাপ। গাছের গুঁড়িগুলো কলকারখানার ধোঁয়ায় কালো হয়ে গেল। কালো গুঁড়ির ওপর সাদা রঙের মথ—সাঁআঁআঁ—ছোঁ মেরে নেবে না মাংসভুক পাখিরা? কি বললে, মিউটেশান? ইয়েস্ মাই বয়, দ্যাট্স্ রাইট্—মিউটেশান না ঘটলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের বা পরিবেশগত চাপই যথেষ্ট নয়। দৈত্য কুলে এক একজন প্রহ্লাদ হবেই আর প্রহ্লাদকুলে এক একজন দৈত্য, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠরা দৈত্য হবে না প্রহ্লাদ, সে প্রশ্নের উত্তর যোগাতে পারে প্রাকৃতিক নির্বাচন।

ইংল্যাণ্ডের কালো মথ আর গ্যালাপাগোস দ্বীপে দ্বিপদ স্তন্যপায়ী, কাষ্ঠ অথবা লৌহদণ্ডধারী।

কালো মথের শত্রু মাংসাশী পাখি।

গ্যালাপাগোসের ওদের শত্রু মাংসাশী সমাজ-ব্যবস্থা।

এখন প্রমাণ সংগ্রহ করা দরকার যে, এদের সঙ্গে হোমো স্যাপিয়েন্স-এর অনেক অমিল তৈরি হয়েছে! যা ক্রমেই বাড়ছে, বংশগতিতে আসছে এবং নতুন প্রজাতি সৃষ্টির সম্ভাবনা হচ্ছে জোরদার।

৪র্থ পাতা

মোক্ষম প্রমাণ অনেক সংগ্রহ করেছি। এখন লিপিবদ্ধ করা দরকার। বিশেষ করে মানুষের সঙ্গে ওদের আচরণ প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য। আপাত দৃষ্টিতে এদের মানুষ বলে ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। বাহ্যতঃ অবিকল

১ এটা ডারউইনের পরের যুগের আবিষ্কার। Biston Betularia-র কথা বলেছেন অশোককুমার দত্ত।

মানুষের মতোই দেখতে। একটু সবুর করো, এখুনি ভুল ভাঙবে। আকার এবং আকৃতিতে মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেই তো চলবে না। গ্যালাপাগোসের রক্ষীরাই আমার গিনিপিগ। হাঁড়ির একটা ভাত টিপলেই যেমন, তেমনি একটা রক্ষীকে খুঁটিয়ে দেখলেই যথেষ্ট।

পার্থক্যের তালিকা——পার্থক্যের তালিকা——পার্থক্যের তালিকা——

নিত্যদিন সূর্যের অনুপস্থিতিতে অন্ধকার গাঢ় হওয়া মাত্র এদের গা থেকে অদ্ভুত এক গন্ধ নির্গত হয়। ছুঁচোর গায়ে দিন ও রাত্রি ভেদে গন্ধের কোন তারতম্য ঘটেনা। কিন্তু রাত হলেই গ্যালাপাগোসের এদের এই গন্ধ ছাড়াটা অমানবিক লক্ষণ। সতর্ক পর্যবেক্ষণের কাছে গন্ধটির উৎসও ধরা দিয়েছে। ওদের নাক ও মুখ থেকে মিষ্টি মিষ্টি বিবশকারী গন্ধ বেরোয়। সার্জেনকে দিয়ে পাকস্থলী চেরাতে পারলে নিশ্চিত জানা যাবে কোন জাতীয় তরল এই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

এরা স্বভাব ভীরু। মানুষ দূরের কথা; জীব জগতের মধ্যেও ভীরুতায় এদের দোসর নেই। সেই কারণেই এরা কোন সময়েই লাঠি সোঁটা অস্ত্রাদি হাতছাড়া বা সঙ্গছাড়া করেনা।

এরা এক বিশেষ ধরনের ক্রীড়ামোদী। একটি মাত্র খেলায় অংশগ্রহণ করতে বা তার দর্শক হতে ভালবাসে। একটি মানুষকে ধরে বেঁধে ডেরায় এনে বারোয়ারি প্রহারের খেলা।

এরা যৌথ প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী। কি পারিবারিক জীবনে, কি কর্মজীবনে এরা ব্যারাকবদ্ধ জীবন যাপন করে। এদের কাউকে কখনো একা দেখা যায়না। বাধ্য হয়ে একা কোন কাজ করবার জন্য এরা মানুষের ছদ্মবেশ ধারণ করে।

বর্ণালীর সাতটি রঙের মধ্যে একমাত্র লাল রঙটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এদের স্নায়ুকেন্দ্রে প্রতিক্রিয়া করে। ফলে প্রচণ্ড ভীতি ও অস্থিরতা বোধ তাড়িত হয়ে উন্মত্তদশা প্রাপ্ত হয়। জীবজগতে ষাঁড়ের মধ্যেই এরকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। শত্রু পক্ষের কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারলে এরা তাই তাদের দেহের অভ্যন্তরে বিন্দুমাত্র রক্তবর্ণ তরল রাখতে দিতে নারাজ।

এদের দেহের অধিকাংশ স্নায়ুগুলি অব্যবহারের কারণে শীর্ণকায় হয়ে গেছে (কালক্রমে মানুষের যেমন লেজ খসে গেছে)। এখন আছে শুধু ঔদরিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভবের জন্য একটি অতি স্ফীতকায় তন্ত্রী।

৫ম পাতা

চন্—চনাচন চন্—চনাচন!

পোতাশ্রয়ের পাগলা ঘন্টি বাজছে।

ছোটাছুটি গোলাগুলি লাঠালাঠি।

ভোঁওপ্—ভোঁওপ্—ভোঁপ্—

জাহাজ হর্ন মারছে। আবার পাড়ি জুড়বে।

কু-ঝিক—ঝিক—ঝিক—

গ্যালাপাগোস থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে।

কেপ্ ভার্ডে! এই তো কেপ্ ভার্ডে[১]!

বুঝেছি! আরো কিছুদিন গ্যালাপাগোসে থাকলেই কাজ শেষ করে ফেলতাম। তার আগেই বদমাইশদের বেতনভুকরা জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে। ভেবেছে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ থেকে বের করে দিতে পারলেই আবিষ্কারের কাজে বাধা পড়বে। মূর্খদের অবৈজ্ঞানিক মন! ওই একই নিদর্শন তো এই কেপ ভার্ডেতেও পাবো।

চক্রান্ত। চক্রান্ত জাল বুনছে। স্বয়ং ধর্মগুরু পোপ ও রাজপরিবার মদৎ দিচ্ছে চক্রান্তকারীদের। জীবজগত সৃষ্টির ধর্মীয় ব্যাখ্যা ছিন্নভিন্ন হবার ভয়ে ওরা দিশাহারা।

কাজ করবার উপযুক্ত পরিবেশের ও পরিসরের অভাব। আলো নেই। ওরা আমায় নিয়ে কি করতে চায় বুঝতে পারছিনা। হাক্সলিও[২] যোগাযোগ করছে না। না—সময় নষ্ট করা চলবে না। পার্থক্যের তালিকাটা সম্পূর্ণ করাই প্রথম কর্তব্য।

পার্থক্যের তালিকা ( সংযোজন )

এই নতুন প্রজাতির লক্ষণাক্রান্তরা আজীবন স্তন্যপায়ী। যে-কোন বয়সে যে-কোন সময়ে সুযোগ পেলেই এরা স্তন্যপানের জন্য লালায়িত হয়।

এরা অতি নিষ্ঠাবান উপাসক। উপাস্য দেবী—শক্রপক্ষ ( মানুষ ) ভুক্ত নারী প্রতিমা। নিরাবরণ দেহই এদের কাছে বিশেষ ভাবে কাম্য। মেকী অলঙ্কার এরা পছন্দ করেনা। উপাসনা কালে এরা সাধারণতঃ সিগারের

১. এই দ্বীপেও কিছুদিন অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন ডারউইন।

২. হাক্সলি ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ সমর্থন করেছিলেন।

অগ্নিপরশে নারী কণ্ঠে ও স্তনসন্ধিতে নক্সা খোদাই করে চিরস্থায়ী হার বা লকেট স্থাপন করে।

জীবগোষ্ঠীর মধ্যে অভিনয় চাতুর্যে এরা প্রথম স্থানের অধিকারী। নিজেদের বেশ পরিবর্তন করে ও খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করে।

মাংসাশী প্রাণীদের সঙ্গে মূল প্রভেদ একটি। ক্ষুধার জ্বালা বা বিপদের সম্ভাবনা না থাকলেও পুরস্কাররূপ পারিশ্রমিকের আশায় এরা হত্যা করে।

কারিগরী বিদ্যার একটি শাখায় এরা অতি পারদর্শী: মানব দেহের কোমলতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কী পরিমাণ প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করতে পারে সেই জ্ঞানার্জনের তীব্র পিপাসা নিবারণের নিমিত্ত নিত্যনতুন যন্ত্র ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করে চলেছে।

দীর্ঘদিন মানুষের সংস্পর্শে থাকার কারণে এদের কারুর মধ্যে যদি দয়া—মায়া—স্নেহ—প্রেম—প্রীতি বা বন্ধুত্ব জাতীয় কোন প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দেয় তাহলে 'মানুষ-হতে-বসার' দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে বলে তাকে অবিলম্বে বধ করা হয় এবং রোগের সংক্রমণ রোধ হয়।

অতুলনীয় এদের প্রভুভক্তি। বিনীতের বিনীত সারমেয়কেও এরা লজ্জায়······

ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ!

বুঝেছি। রামলক্ষ্মণ এসে গেছে। প্রভুদের দেখলে এরা কিঁউ কিঁউ করে আর আমাকে দেখলে ঘেউ ঘেউ।

৬ষ্ঠ পাতা

হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! জয় বিজ্ঞান! জয় চেতনা! আর পার্থক্যের তালিকা লম্বা কবার দরকার নেই। রামলক্ষ্মণের বাচ্চা হচ্ছেনা। তিন বছর চেষ্টার পর চিকিৎসা বিজ্ঞান হার মেনেছে। দুর্বল মুহূর্তে কবুল করে ফেলেছে রামলক্ষ্মণ—না, আমার কাছে নয়। ওর প্রজাতির এক বন্ধুর কাছে। আমি শুনে ফেলেছি।

এতএব আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল প্রমাণিত।

রামলক্ষ্মণ ও তার বর্তমান পত্নী কোন নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পারবে না, কখনো নয়, কোন ভাবেই নয়।

রামলক্ষ্মণদের পরিবার মোঘল আমল থেকে কেপ ভার্ডের কারারক্ষী।

কিন্তু তার স্ত্রীর জন্ম মানব প্রজাতির মধ্যে। কি করে বাচ্চা হবে? প্রজাতির সংজ্ঞাই তো বলে যে, দুটি ভিন্ন প্রজাতির সদস্যের মধ্যে দৈহিক মিলন নতুন প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেনা।

অতএব···অতএব···আমার প্রাথমিক সন্দেহ, সন্দেহ থেকে পর্যবেক্ষণ, ও পর্যবেক্ষণের ফলাফল বিশ্লেষণ আমাকে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছে দিয়েছে। রামলক্ষ্মণরা মানব প্রজাতির মধ্যে পড়ে না। নতুন এক প্রজাতি এসেছে পৃথিবীতে। যুগ যুগ ধরে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে এইভাবেই তো সৃষ্টি হয় নতুন প্রজাতি। ধন্য প্রকৃতি! ধন্য!

"প্রজাতির মধ্যে উপ-প্রজাতিরা ক্রমে ক্রমে পার্থক্য সঞ্চয় করে। এই পার্থক্যগুলি বংশগত ভাবে উত্তরসূরীরাও লাভ করে। তারপর পার্থক্য যখন এমনই প্রকট হয়ে ওঠে যে দুটি উপ-প্রজাতির মধ্যে প্রজননক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, তখন বলা চলে যে একটি নতুন প্রজাতির অভিব্যক্তি ঘটেছে।"[১]

৭ম পাতা

আমি ডারউইন। আমি বিজ্ঞানী। এবং আমি মানুষ। শুধু আবিষ্কার করেই সন্তুষ্ট হতে পারিনা। মানব প্রজাতির আর পাঁচজন সদস্যের মতো আমারো একটা সমাজ সচেতন ভূমিকা আছে। আমি ত আর রামলক্ষ্মণদের প্রজাতির একজন নই।

রামলক্ষ্মণকে জানিয়ে দিয়েছি, এই বৌ-কে ছেড়ে তার নিজের প্রজাতির কাউকে বিয়ে করলে নিশ্চয় বাবা হতে পারবে।

এবার আমার প্রজাতির উদ্দেশে নিবেদন করছি। ফিসফিস করে বলব কিন্তু।

শ্—শ্—শ্—আরো কাছে এসো। কাছে এসো। মুখের কাছে কান নিয়ে এসো। হ্যাঁ—এইবার বলি, শোনো—

কোনো ভয় নেই। মানুষের কোনো ভয় নেই। এই নতুন প্রজাতি মানুষের যত বড় শত্রুই হ'ক না, আতঙ্কের কারণ নেই। জানি জানি, মানুষ ওদের সব চেয়ে প্রিয় খাদ্য। শুধু প্রিয় খাদ্য হলে ভয় থাকত কিন্তু মানুষ যে ওদের একমাত্র খাদ্য! হাঃ হাঃ হা—শ্ শ্—ভুল ক'রে জোরে হেসে ফেলেছি। কথাটা বোঝা গেল না, এই তো? ওই একমাত্র খাদ্যের বাপারটা?

[১] সম্ভবতঃ ডারউইনের 'অরিজিন অফ স্পিসিস' থেকে উদ্ধৃতি।

ওভার অ্যাডাপ্‌টেবিলিটি! পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়াটাই প্রাকৃতিক নিয়ম কিন্তু অত্যধিক খাপ খাইয়ে নেওয়াটা আবার ভবিষ্যতে অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি করতে পারে। প্রকৃষ্ট উদাহরণ: নিউজিল্যাণ্ডের হুইয়া পাখি। হুইয়াদের মেয়ে পাখিগুলোর ছিল সরু লম্বা ঠোঁট, ছেলেগুলোর ছিল বেঁটে মোটা শক্ত ঠোঁট। ছেলেরা গাছের গুঁড়িতে করত গর্ত, মেয়েরা টেনে আনত পোকা। ওদের খাদ্য। ওদের মতো নিষ্ঠাবান দাম্পত্য জীবন জীবজগতে বিরল ছিল। কিন্তু সংকট এল—ওভার অ্যাডাপ্‌টেবিলিটি-র সংকট। পরিবেশের সঙ্গে বড় বেশি খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। অভ্যাস পরিবর্তনের কোন জরুরী সংস্থান ওদের জীন্-এর মধ্যে ছিল না। ফলে পরিবেশ যখন পালটাল, ওরা একেবারে অসহায় হয়ে গেল। পারল না—হেরে গেল—মুছে গেল—

হ্যাঁ, তাই বলছি, মানব প্রজাতি এখন রক্ষাবাহিনীর একমাত্র খাদ্য, তাই ওরা বহাল তবিয়তে আছে। বংশবৃদ্ধি করছে। কিন্তু এই পরিবেশ যদি পালটায়, তখন? ওরা জানে না ভবিষ্যতে ওদের জন্য কি অপেক্ষা করছে। খাদ্য হিসাবে মানুষকে যেদিন পাবে না, কোন খাদ্যই আর ওদের জুটবে না।

ওদের পায়ে মাথা খোঁড়ার দরকার নেই…

চোঙে মুখ দিয়ে আবেদন ফোঁকার দরকার নেই…

অবিলম্বে পরিবেশ পালটানোর দিকে নজর দিতে হবে!

তৈয়ার হো মানুষ ভাইসব! এদের নির্মূল করতেই হবে।

"প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত প্রজাতির অভিব্যক্তি (এবং বিনাশও) ঘটে এবং প্রজাতি বিশেষ সুরক্ষিত হয়।"

মানুষ কারুর খাদ্য হতে পারে না!

—ডায়েরি সমাপ্ত—

কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলখানায় জীববিদ্যার অধ্যাপক অশোককুমার দত্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে নিহত হন। সম্প্রতি অশোককুমারের একটি ডায়েরি আমার হস্তগত হয়েছে। জীবনের শেষ পর্বে তিনি অদ্ভুত কিছু কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। জেল কর্তৃপক্ষ অশোককুমারের বিকৃত মস্তিষ্ককে তাঁর গ্রেফতারের কারণ ও ডায়েরিটিকে তার প্রমাণ স্বরূপ দাখিল করলেও পাঠকরা হয়তো বা নোটবইয়ের ছত্রান্তরে ভিন্ন কোনো সূত্রের সন্ধান পেতে পারেন। বিশেষ করে অশোককুমারকে উগ্রপন্থী সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে যখন অনেকে এখনো সন্দেহ পোষণ করেন। ডায়েরির পৃষ্ঠাগুলি যথাপ্রাপ্ত মুদ্রিত, পাদটীকাগুলি পাঠকের সুবিধার্থে আমার সংযোজন।

# বার্তা



পিছনে পাঁচিলের বুড়ো ইঁট। ইঁটের জীর্ণতার ফোকরে ভিজে চটচটে শেওলা এবং একটি দেড় হাত অশ্বত্থ গাছ। সামনে ছ'জন উদ্যত রাইফেল-ধারী। পিছনে কালো গাড়ির এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ।

মাঝখানে সন্তু বিল্টু, আনন্দ আর তপনদা। এবং সকলেই নিশ্চল।

গাড়ির হেডলাইটে চারজনের চোখের তারা কুঁচকে আছে। সি. আর. পি সেপাইগুলোর পিঠে আলো পড়ছে। তাদের মুখে অন্ধকার।

বোল্ শালা—মাও সে তুঙ শুয়োরের বাচ্ছা। বোল্!

'বলো, বলো—বললেই তোমাদের ছেড়ে দেবো! মাও সে তুঙ শুয়োরের বাচ্চা বলে স্বীকার ক'রে নাও, এখুনি ছেড়ে দেবো। অসুবিধের কি আছে।' অফিসারের ভাষা সেপাইদের মতো নয়। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। শিক্ষিত। আর শিক্ষাই শালীনতার বাহন। 'এক মিনিট সময় দিচ্ছি—চিন্তা ক'রে ছাখো—যে-যে বলবে তাকেই ছেড়ে দেবো—এখন বাজে—', অফিসার পাশ ফিরে গাড়ির হেডলাইটের আলো নিলো ঘড়ির ওপর, 'ঠিক দু'টো সতেরো—তার মানে—'

সন্তু: শালা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে! অতই সোজা। তপন দা থাকতে আমরা কেউই নিজে থেকে……

বিল্টু : ডিসিশান তপনদার ব্যাপার। আমার ভাবার কিছু নেই। সেপাই হারামীরা এত মাল্ টেনেছে যে……

আনন্দ : যদি ওইটুকু বললেই ছেড়ে দেয়, ক্ষতি কি বলতে, কিন্তু তপনদা কি……না, তপনদা যদি মাথা নিচু না করে সেটা হঠকারী সিদ্ধান্ত হবে। এরকম পরিস্থিতিতে—

তপনদা : সন্তু বিল্টু আনন্দ আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। আমি যা বলবো ওরা মেনে নেবে। আনন্দ ভয় পেয়েছে বুঝতে পারছি। স্বাভাবিক।

…… দুটো বেজে সতেরো মিনিট দু সেকেণ্ড……

সন্তু : মা যখন কাল খবর পাবে কী করবে ? খবর পাবে কিনা সেটাও অবশ্য বলা মুস্কিল। কিন্তু পেলেও কি……মা. তুমি ভুল করেছো মা, ভুল বুঝেছো, অবিচার করেছো আমার ওপর। আমি মরে গিয়েও তোমাকে বোঝাতে পারবো না ? মা এত খোঁড়াচ্ছো কেন ? সায়াটিকার ব্যথাটা আবার……দিদির চোখের কোল বসে ঘন কালি, সাজলে অবশ্য… মার্কেটের ধারে কালো গাড়িটার চাকাগুলোয় আবার সাদা-ডোরাকাটা … না মা, এটা ভুল, আমি দায়িত্বজ্ঞানহীন ন'ই। ক্লাশ টেন, তারপর হায়ার সেকেণ্ডারি, তারপর বি. এ. এবং তারপর বেকার। হিসেব করেছো কোনদিন ? মেসোমশাই ? তুমি কি বিশ্বাস করো, মেশোমশাই চাকরি ক'রে দেবে ? শালা ! ওদের বাড়িতে পা দিলেই নিজেকে আমার…বাবা মারা যাবার পর দু'শো টাকা ঠেকিয়েছিল। আসলে টাকা ধরিয়ে কর্তব্য খালাস। আর আসতে হলো না আমাদের ঘরে। মা তুমি পা ছড়িয়ে বসে রান্না ক'রো না ! আমার বড্ড খারাপ লাগে। মা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে উঠোনে নামার আগেই সাদা-ডোরাওলা চাকাগুলো তোকে নিয়ে অনেক দূরে চলে যায়, তাই না দিদি ? দিদির সঙ্গে কতদিন কথা বলিনি ! ধরে নিচ্ছি বি-এ পাশ করলে চাকরি হতো। কিন্তু ক্লাশ টেন্ থেকে বি. এ—ক' বছর ? ইস্কুল না ছাড়লেও সাদা-ডোরাওলা কালো গাড়ীতে চড়তে হতো দিদিকে। আমাদের কি এমন অভাব ছিল যে তোকে· ·দিদি তুই সর্টকার্ট পথটা খুব চটপট্ চিনে ফেলেছিস ··

বিল্টু : হাতে আঠা মেখে সঙ সেজে বেপাড়ায় মরতে হবে নাকি ! কেস কিচাইন। কোনো মানে হয় ! শেষ পর্যন্ত পোস্টার মারতে গিয়ে—তাও যদি

অ্যাক্‌শানে ধরা পড়তাম! আঠা শুকিয়ে হাতের তালুটা মাইরি চড়্‌চড়্ করছে। শালা গুলি খেয়ে মরবার পর আমারও ওই রকম দাঁত ছিরকুটে যাবে নাকি? চোখ মার্বেলের মতো? জীবন গাঙ্গুলীর মতো? কক্ষণো না—জীবন গাঙ্গুলী ভয় খেয়েছিল—নিশ্চয় চিৎকার করতে যাচ্ছিল। ওইরকম কুচ্ছিত ভাবে মরা চলবে না। হ্যাঁ, এই এক কথা। আচ্ছা, মরে যাবার সময়েও মানুষের কি খেয়াল থাকে শেষ পর্যন্ত? আলবৎ থাকে। থাকতেই হবে। ছি ছি—শালা দুটোকে মেরে মরতে পারলে আপসোস থাকতো না। এইসব পোস্টার-ফোস্টার মারার যে কী দরকার! এই হারামীরা তো কই পোস্টার মারে না! আজ আমাদের চারজনকে খুন করার পর কি কাল ওরা ওয়ালিং করবে! ছোঃ! জানি জানি তপনদা, তুমি বলবে ওদের হাতে খবরের কাগজ আছে। বেশ—মেনে নিচ্ছি কাজটা খুব দরকারী। হলো? নণ্টে আর ঝণ্টে আমাদের বিট্রে করেছে। নিশ্চর বাঞ্চৎরা কালো ভ্যান্ দেখেই চোঁচা মেরেছে। একটু যদি আওয়াজ দিতো—মারো গুলি! যা হবার হয়েছে। কিন্তু নণ্টে আর ঝণ্টের কাণ্ডটা সবাইকে জানিয়ে দেওয়া দরকার। না হলে পরে ওরা আবার অন্যদের বিপদে ফেলবে।

আনন্দ : বমি পাচ্ছে। কী যন্ত্রণা—মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সত্যিই কি আমাদের মেরে ফেলবে? নাকি ভয় দেখাচ্ছে? কি করেছি আমি? পোস্টার মেরেছি। কোনোদিন অ্যাকশান্ করিনি। পেন্সিল কাটতে গিয়ে বুবুর আঙুল কেটে রক্ত···রক্ত দেখলে গা গোলায় আমার! চিবকাল। পুরো ব্যাপারটাই বোধহয় আমাদের ভয় দেখাবার জন্য। শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় থানায় নিয়ে যাবে। আমি তো আসতে চাইনি পোস্টার মারতে। না. ওরা জোর করেছে, তা নয়, কিন্তু তপনদার কথাবার্তা যা—না বলতে পারিনি। এখন উপায়? উপায় কি? তপনদা. বুঝতে পারছো? শুধু শুধু আমায় টেনে আনলে! আমি তো বাংলাটা ভাল লিখি। স্বীকার করবে তো? দুটো হ্যাণ্ডবিল্. পার্টির, আমারই লেখা তো! কাজে তো এইভাবেও লাগতে পারতাম। রাজনীতি আর সংস্কৃতি এক ক'রে ফেলে এই বিপদে···মাগো···ওঃ ···লু শুন-এর চারটে প্রবন্ধ অনুবাদ ক'রে পাঠাইনি? গ্রামের কমরেডদের জন্যে? সেটা কাজ নয়? সহ্য করতে পারছি না! আমি কি পড়ে যাবো? আরেকটু পিছিয়ে দাঁড়ালে তো দেওয়ালে ঠেস রাখতে পারতাম। না—না —খুব রিস্কি! একটুও নড়া চড়বে না! পালাবার চেষ্টা করছি ভেবে ভুল ক'রে

যদি ! না না—তা কখনো হয়। মিথ্যে ভয় পাচ্ছি। এত নৃশংস হবে ? মাও সে তুঙ-এর কটা উদ্ধৃতি, পোস্টার মারার জন্যে—না, এটা পার্টির প্রচার। করতেই হয়। ক্যাডারদের খেপিয়ে তুলতে। খেপিয়ে রাখতে না পারলে কাজ করিয়ে নেওয়া যায় না—কিন্তু আমি কি ক'রে এত বড় ভুলটা করলাম। সব বুঝেও। তপনদা বলল বলেই আমার বীরত্ব দেখাবার কী দরকার ছিল। এই বীরত্বের কী প্রয়োজন ? এর চেয়ে ঢুটো অনুবাদ তো…

তপনদা : সঞ্জু বিল্টু আনন্দ ! কী ভাবছে ? সারেণ্ডারের কথা ভাবছে নাকি ? আনন্দ ভেঙে পড়েছে নিশ্চয়। স্বাভাবিক। ক্লাস্ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড। দোষ দেওয়া যায় না। এতটা তৈরি ছিল না ! না আনলেই হতো। বুঝতে পারিনি নিজেও। সঞ্জু ! সঞ্জু কি ভাবছে ? আমাদের চারজনের প্রাণের চেয়ে পার্টি অনেক ইম্পরটেণ্ট ! হ্যাঁ—ঠিক তাই। সঞ্জু এসব কিছুই ভাবছে না। আমার ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত। সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথা ওর। অ্যাকৃশন করার সময়ে বা তার আগে বা পরেও কোনো বিকার দেখিনি কখনো। আর বিল্টু ? বিল্টু আমায় দোষ দিচ্ছে খালি হাতে এখানে টেনে আনার জন্যে। ওর হাত নিশপিশ করছে। বিল্টু ঘাড় কাৎ ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে…এরই মধ্যে উদ্ধত। ওর বয়স চোদ্দ, কেউ ভাবতে পারে ? এগারো বছর বয়স থেকে মাস্তান। ভোটে দলবাজি, স্ট্রাইকে ইউনিয়ানবাজী …প্রয়োজনে সবাই ওকে ডেকেছে। আমরাও কি ওর সাহসটাকে ব্যবহার করেছি ? তা হলে আমরাও তো—না, সেটা সত্যি নয়। রাজনীতির পাঠ হয়তো বই থেকে নেয়নি কিন্তু…আমরা পয়সার বদলে ওর কাছ থেকে গুণ্ডাবাজি দাবী করিনি। গত বছরে ওর যা দুরবস্থা গেছে টাকা পয়সার ব্যাপারে…এমন কোনোদিন হয়নি। কিন্তু এই মুহূর্তেও কি আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারছে ? মনে করছে না তো খালি হাতে মরবার ব্যবস্থা আমি—না না, আমি শুধুই ওদের অবিশ্বাস করছি। দ্বিধাটা আমার নিজের। আমায় শুধু চারজনের কথা ভাবলে চলবে না। পার্টির কথা—বিপ্লবের প্রয়োজনই সবচেয়ে বড়—আমার সিদ্ধান্ত সেই রকম হবে। তাতে যদি কেউ মনেও করে—না না, আমায় নির্ভীক ভাবে এই চরম মুহূর্তটার মোকাবিলা করতে হবে। অনেক অনেক কাজ বাকী রয়ে গেল। অনেক ভুল শোধরানো দরকার। আজই কি সব মনে পড়ছে ? এতদিন কী করেছি ? নেতা হয়েই কি খুব সন্তুষ্ট মনে…আসলে কাজের মধ্যেই ভুলগুলো শুধরে নিতে চেয়েছি

বোধহয়। তার মানে নিজের নেতার স্থানটা না টলিয়ে, এই তো ? কথাটা কি ঠিক ? তাহলে কেন নিজের কাজের আলোচনা সমালোচনা শুরু করিনি··· এখন আর আপসোস ক'রে কী লাভ। সেই গ্রামে যাওয়া হলো না। শহরে কি কাজ নেই ? মেকানিক্যাল চিন্তা আসছে। শহর মানে শ্রমিক। শ্রমিক সংগঠন গড়তে পারতাম যদি ঠিক মতো—পারিনি। স্বীকার করতেই হবে, শ্রমিক ফ্রন্টে আমাদের পার্টি কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেনি। সব শ্রমিকই কি গ্রামে চলে যাবে নেতৃত্ব দিতে ? শ্রমিকরা শ্রমিক হিসেবে কি ভূমিকা নেবে ? ভুল করেছি বাবার মুখের দিকে চেয়ে গ্রামে যেতে অস্বীকার ক'রে। আজ মরে যাই যদি, কাল কে দেখবে বাবাকে ? সেই তো একই ব্যাপার। ক'দিন আগে আর পরে। ইজিচেয়ারের ক্যানভাসটা ছিঁড়ে গেছে। বাবা বসবে কোথায় ? সকাল ছ'টা থেকে রাত বারোটা ? বাবা অথচ একবারো কিছু বলেনি। গ্রামে চলে গেলে বাবা আপ্‌সেট হয়ে যেতো। জ্যান্ত অবস্থায় অসুস্থ মানুষকে ছেড়ে চলে যাওয়া আর মরে সরে যাওয়া। ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত! শান্তা বাবার খোঁজ নেবে। ইজিচেয়ারের ক্যানভাস পাল্টে দেবে। আমায় ছাড়া বাবা আর কাউকে আপনজন মনে করে না। ভুল চিন্তা। কিন্তু সব ভুল শোধরানো যায় না। ভুল শোধরানোরও একটা বয়স আছে। শেষ বিচারে পৃথিবীটা যুবকদের—যৌবনেরই রাজত্ব—মাঝে মাঝে খোঁজ নিও শান্তা—

······দুটো বেজে সতেরো মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড···

সন্তু : মা, কথা বলছো না কেন ? কী করেছি আমি ? আমায় দোষ দেবে দাও, দিদিকে প্রশ্রয় দিও না। দিদি, নিজের অন্যায়কে ঢাকার জন্য একটা যুক্তি হিসাবে আমাকে সামনে দাঁড় করাসনি। আমি যা করেছি মায়ের জন্য করেছি—দিদির জন্য করেছি—হ্যাঁ. ঠিকই করেছি। এইটাই পথ। সমস্যাটা শুধু আমাদের নয়। কতদূর কী করতে পেরেছি তা অবশ্য জানি না। হর্ন দিচ্ছে কে ? সাদা চাকাওলা···অনেক কাজ বাকী রয়ে গেল···হ্যাঁ· ·দিদি, ওই সাদা চাকাওলা গাড়িবাবুকে শেষ ক'রে দিতে পারিনি···স্রেফ দুর্বলতা। দুর্বলতার জন্য। ইচ্ছে করলেই পারতাম। একটা জোঁক কমে যেত। দিদির কপালে সিঁদুরের দাগ দেখেছি···তিন দিন বাদে ফেরার পর···কেন পারলাম না তবু ? কেন ? একা একা একাজ করা ঠিক হতো না। আমার হাতে

পার্টি অস্ত্র দিয়েছে···ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে···না, এ শুধু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়। সে তো আমি জানি। তবু বার বার মনে হয়েছে, এই বিদ্বেষ মেটাবার জন্যই পার্টিতে যোগ দিইনি তো! জানি, তপনদা বলবে, তোর আমাদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। সমস্যাটা তুলে ধরা। লোকাল কমিটি। ইনভেসটিগেশান হতো। ইন্‌ভেসটিগেশানে মৃত্যুদণ্ড পেতই হারামীটা। এমন সাদা চাকাওলা গাড়ি কি একটা? আমার দিদি কি একা···মাপ করো তপনদা, ইন্‌ভেসটিগেশান মানে দিদিও তো·· বলতে পারিনি···মধ্যবিত্তের লিমিটেশান। খুব সত্যি। যতই হোক দিদি···দিদি, দেখছিস তো, তোর জন্যে···মা, শোনো, দিদিকে আমি ভালবাসি। সত্যি ভালবাসি। দিদি, তুই আমাকে তোর ভাগের রসগোল্লা খাইয়েছিলি···ক্লাশ ফোরে···তোমরা কেউ বুঝলে না! আমি মরার পরেও কি বুঝবে না? অমল স্বপনদের বাড়ি থেকে অমন দূর্ দূর্ করবে? ওরা আমার কমরেড। ওরাই তো দেখবে তোমাদের। ওদের একটু ভালবাসতে পারো না?

বিল্টু: ছাখো ছাখো, সি-আর-পি হারামীগুলোকে—কাঁপছে। ঈশ্! কী চান্স! পাঁচিলের পিছন থেকে গোটা দুয়েক কেউ যদি টপকে দিতো। ওহ্—সব শালা সিয়ারাম ক'রে হাওয়া হয়ে যেতো! জনা দুয়েক অন্তত আমরা ভাগতে পারতাম। কিন্তু কেউ তো খবরই রাখে না। বেপাড়া। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফিনিশ হয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয়। এই জন্যেই শালা জিনিসপত্তর দরকার—শুধু চোরা-পেটোর কম্মো নয়। থাকতো হাতে এল্ এম্ জি—শালা পুরো ব্যাটেলিয়ানকে শুইয়ে দিতাম। না না তপনদা, তোমার কথার এটা প্রতিবাদ নয়। বলছি, মাঝে মাঝে দরকার পড়লে ব্যবহার করার কথা। যেমন আজকে—এখন! তুমিই বলো, শুধু শুধু ধরা পড়ে মরে গিয়ে লাভ আছে? সেপাইগুলোর অবস্থা কাহিল। রাইফেল তাক্ ক'রে রেখেছে, কিন্তু কাঁপছে ভেতরে ভেতরে। অফিসারটা কিন্তু স্টেডি—ঝানু মাল। টস্‌কাবার জিনিস নয়। ও শালা জীবন গাঙ্গুলীর মতো মুখ হাঁ ক'রে মরবে না। সেটা জানি। এই জন্যেই বলি, ছুঁচো মেরে শুধুই হাত গন্ধ হয়। যারা ভয়েই আধমরা তাদের আর খতম ক'রে লাভ কি? চমকে দিলেই তো হলো। তাছাড়া মনটাও তো কন্‌কন্ করে। খতম করতে হয়তো এমনি মাল। যেগুলো মানুষ নয়। হ্যাঁ—এই সাফ কথা। সে তো হলো। এখন উপায়? এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—আচ্ছা, যদি সোজা ছুট

মারি ? ডাইনে বা বাঁয়ে চেপে ? সেপাইয়ের বাচ্চারা সবকটা অমনি আমার দিকে ফিরে—হ্যাঁ, কিন্তু তার মধ্যেই লাক্ থাকলে ওই গলিটার মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে পারি। তার চেয়েও বড় কথা, তপনদা বিল্টু আর সঞ্জু যদি ঠিক তখুনি ছুট মারে উল্টো দিকে—চারজনের মধ্যে দু'জন অন্ততঃ কাটবার একটা চান্স নিতে পারে। আরো ভালো হয়, আমি যখন ডানদিকে ভাগবো, যদি বিল্টু তখন সোজা সেপাইদের দিকে ছুটে যায়। কোনো রকমে গাড়িটার পিছন দিকে যদি চলে যেতে পারে, কিছুতেই ধরতে পারবে না। এই গলি দিয়ে গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতেই—হ্যাঁ, তবে তার জন্যে সাহস চাই। দৌড়নোর ক্ষমতা। আনন্দ ভীতু—তপনদা অত ছুটতে পারবে না—পারলে সঞ্জুই! আনন্দ আর তপনদা অবশ্য চান্স নিতে পারে বাঁ দিক্ দিয়ে ভাগবার—কিন্তু—কিন্তু আমি ছোটার সঙ্গে সঙ্গে ওরা যদি দৌড় না লাগায়, তাহলে কিছুই হবে না। ওরা হয়তো তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর আমি মুখ থুবড়ে পড়বো। তার চেয়েও শালা সাংঘাতিক—সেপাইগুলো যদি ভাবে আমি ভয়ে পালাচ্ছিলাম! আর অফিসারটা যদি তখন হাসে—শালা শুয়োরের বাচ্চা, জানিস না বিল্টু কখনো···

আনন্দ : আসলে ইগো! হ্যাঁ। আমার মুখের ওপর বলবে, বিল্টু সঞ্জু আমার চেয়ে অ্যাড্‌ভান্সড্! বাজে কথা। এটা সত্যি নয়। সঞ্জুর দৌড় নিউ ডেমোক্রেসি আর কনট্রাডিক্‌শান। বিল্টু তো আরোই—রেডবুক! ওই দিয়ে রাজনীতি হয়না। সাহস ? তাহলে বোকারাই সবচেয়ে সাহসী। যারা না বুঝেই মরে যায় তাদের মরতে ভয় পাবার কোনো কারণই নেই—প্রশ্নই ওঠে না। যারা জীবনকে ভালবাসে তারাই মরতে ভয় পায়। মরার সময় শহিদ বেদি উঠবে বলে ক'জন ভাবে ? ক'টা ইট লাগে শহিদ বেদিতে ? একশো ? এখন ইটের হাজার দু'শো টাকা। একটা ইট কুড়ি নয়া। খালি মরা আর মরা। খালি মরার কথা ভাবছি কেন ? আমি তো আর মরছি না। মরবো কেন ? না না। তা কখনোই ঘটবে না। হতেই পারে না। কেন যে বাড়িতে বলে আসিনি! ছোড়দিকে জানিয়ে এলেও এতক্ষণে বাবা নিশ্চয়—অবশ্য থানা থেকে ছাড়িয়ে আনতে বাবার কোনো অসুবিধে হবে না। এরা যদি জানতো আমার পরিচয়, এই রকম রসিকতা করার সাহস পেতো না। না না, ভয়ের কিছুই নেই, শুধু তপনদা যদি গোঁয়ার গোবিন্দের মতো—তপনদা যদি রাজী হয়ে যায় ভালই, না হলে আমি—এবার ছাড়া

পেলে আর এই হঠকারী কাজে···আমি সৎ কিনা প্রমাণ দেবার দায়িত্ব-- বিশ্বাস করতে পারো তো আমার সাহায্য নিও, নইলে নিও না—মিটে গেল। আমাকেও মনটা শক্ত করতে হবে। বিপ্লবীদের একজন হবার লোভ—লোভই তো—তাছাড়া কি—শুধু সমর্থক বলবে আমাকে এটা সহ্য করতে পারিনি বলেই ভুলটা করেছি। কিন্তু সমর্থক হয়েও যদি বিপ্লবের জন্য কিছু করা যায়—কি দরকার বিপ্লবী নাম কেনার? নামে কি আসে যায়? তপনদা চুপ ক'রে কেন? এখনো সেই হঠকারী জেদ! না না—প্লিজ তপনদা, প্লিজ। এমন ভুল করো না। এতগুলো জীবন নিয়ে তুমি···এটা বিপ্লব নয়। আর ক' সেকেণ্ড? হয়তো ইয়ার্কি করছে। কিন্তু বিশ্বাস কি? হঠাৎ যদি··· অফিসারের আদেশ না মেনেই গুলি চালিয়ে···ভুল ক'রেও তো ট্রিগারে আঙুলের চাপ পড়ে যেতে পারে। ওগুলো কি লোডেড্? বলো বলো তপনদা—তোমাকে বলতেই হবে। চার চার জনের জীবন···

তপন: সত্যিই শান্তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞতা জানানো হয়তো শান্তাকে ছোট করা। তবু—আর যে কিছু দেবার নেই আমার। শান্তা, তুমি তো আমায় প্রতারক ভাবনি, সেটা আমার কাছে খুব মূল্যবান। একটা অবলম্বন। নিজেও ভাবিনি কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য ঠেকবে। কেউ বিশ্বাস করতে পারে ভাবিনি। আসলে আমি শান্তাকে আণ্ডার এষ্টিমেট করেছি। শান্তার কমিটমেণ্টকে। তাই শান্তা বিশ্বাস করেছে দেখে অবাক হয়েছি। বিয়ে করা যে সম্ভব নয়, মানে কোনো স্থায়ী সম্পর্ক—সে তো আগেই জানতাম। তারপরেও সম্পর্কটা কেন অতদূরে টেনে নেওয়া? শান্তা, তুমি কি জানো এটা অন্যায়? এটা দুর্বলতা। মুখে যা-ই বলে থাকি, এটা সত্যিই দুর্বলতা। শুধু প্রেম নয়—তুমি আমায় অদ্ভুত একটা শান্তি দিয়েছো। একটা নির্ভর করায় জায়গা। কেমন নিশ্চিন্ত হতাম তোমার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ পেলেই। মায়ের আদর কোনদিন পাইনি আমি। অল্প বয়সে যাদের মা মরে যায়, তাদের সবারই কি একরকম কিছু আকাঙ্খা থেকেই যায়? সব জেনে-শুনেও তোমার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারিনি। তুমি তো বলেইছিলে, তোমার লিমিটেশানের কথা। তবু, ভেবেছি—মানে নিজেকে দিয়ে ভাবিয়েছি--একদিন ঠিক তুমি পার্টিতে যোগ দেবে। ভেবেছি, কারণ না ভাবলে সম্পর্কটা যে হারাতে হতো। হারাতে খুব ভয় ছিল। শান্তা, তুমি সাহায্য না করলে আমি এভাবে মনপ্রাণ উজাড় ক'রে পার্টির কাজে ঝাঁপিয়ে

পড়তে পারতাম না। তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছো, কাজ করতে দিয়েছো, আবার তারপরেও যখন ফিরে এসেছি···না, আমি ভাবতে চাই না···অনেক পেয়েছি তোমার কাছে। বোধহয় দেবে বলেই দিয়েছো, পাবার জন্য দাওনি? তুমি আমার এসব কথা বিশ্বাস করোনি কোনোদিন। হয়তো করবেও না। তুমি আমায় যতো বড় ভাবো, আমি তা নই। কক্ষণো না। তারজন্যে আমার দুঃখ নেই। মানুষ যন্ত্র নয়। নিখুঁত নয়। প্রেম ভালবাসা মায়া মমতা সবই আছে তার। আর তাই যখন কর্তব্যের তাগিদে এগুলোকে পুরো অস্বীকার করতে হয়, বাধ্য হতে হয়—তার ঘৃণা জাগে। আজ যে আমরা চারজন এখানে দাঁড়িয়ে তার কারণও তো তাই। মরবো বলে তো আজ মরতে বসিনি। বাঁচতে চাই বলেই—না, না, আমি মরার কথা নিয়ে ভাবতে পারি না। আবোল তাবোল চিন্তা করেছি। সময় তো শেষ হয়ে এলো। শুধু নিজের কথা ভেবেই—আমি এখন একা নই—চারজন—চারজনের দায়িত্ব আমার ওপর। এখন কি করা উচিত? আমার সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে পার্টির সিদ্ধান্ত। যদি শুয়ারদের কথামতো মেনেও নিই—মানে ট্যাকৃটিকালি যদি—হ্যাঁ, মাথা নিচু করায়—যদি করিও—বাঞ্চোৎরা কি ছেড়ে দেবে আমাদের? বিশ্বাস করা শক্ত। তাছাড়া মাথা নিচু করা মানেই শরীরের মৃত্যুর আগে বিশ্বাসের মৃত্যু ঘটাবো আমি। কিন্তু সঞ্জু বিল্টু—ওরা যদি সবাই এক্সপেক্ট করে—মানে একটা চান্স নেওয়া আর কি—শেষ চেষ্টা হিসেবে—কিন্তু ওরা কি এরকম কিছু এক্সপেক্ট করতে পারে! কি চায় ওরা আমার কাছে! কেন আমি এ প্রশ্ন করছি? তবে কি আমি যা চাইছি সেটা ওদের ইচ্ছে বলে চালাতে চেষ্টা করছি? আমি কি ভয় পেয়েছি? আমি কি চাই এখন আমার কাছে? কি চাই আমি? মৃত্যুকে এত বড় ক'রে দেখছি কেন? কেন মেনে নিতে পারছি না? এর চেয়ে আরো বড়ো স্যাক্রিফাইস্ করবার জন্যে তো--তবে কি সেগুলো শুধু কথার কথা ছিল—এইটুকু দ্বিধাই বা আসছে কেন? প্রথম মুহূর্তেই গর্জে ওঠা উচিত ছিল—মাও সে তুং জিন্দাবাদ! কেন পারিনি? কেন? পরিস্থিতিই কী তার জন্যে দায়ী? এই অন্ধকারে, সবার চোখের আড়ালে, অজান্তে, আমাদের মৃত্যু কোন্ কাজে লাগবে? কাদের জন্য আমাদের এই এই মৃত্যু? কেউ যদি না-ই জানলো, অপঘাতে মরার মতো এই মৃত্যুর কি দাম? মৃত্যুকে যদি কাজেই না লাগাতে পারা যায়—

······ছুটো বেজে সতেরো মিনিট পঞ্চান্ন সেকেণ্ড······

—'আর পাঁচ সেকেণ্ড! ফাইভ সেকেণ্ডস মোর!' অফিসার মনে করিয়ে দিল। 'এখনো সুযোগ আছে। হয়তো ভাবছো, আমি কথা রাখবো না। বিশ্বাস করা যেতে পারে। আই মিন্—বিশ্বাস করা ছাড়া অবশ্য দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ। করার কিছু নেই।'

বুন্টু এক ধাবড়া থুতু ছিটিয়ে দিলো।

আনন্দের ওয়াক্ উঠল। মুখ হাঁ ক'রে হাঁপাচ্ছে। ঘামে ভিজে যাচ্ছে শরীর।

সঞ্জু সামান্য ঘাড় কাৎ ক'রে তাকাল তপনদার দিকে। তপনদা কী দেখছে ঘাড় উঁচু করে? সঞ্জু তপনদার দৃষ্টি অনুসরণ করতে চাইলো।

দূরের অন্ধকার আকাশে ডোরা ডোরা সাদা রেখা। এক এক ঝাঁক সাদা আলোর সমান্তরাল নকশা। কি ওগুলো? বাড়ির জানলা খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে ঘরের ভেতরকার আলো। একটু আগেও তো অন্ধকার ছিল। ওই—ওই আরেকটা—পাশের বাড়িটাতে—তার মানে লোক দেখছে—জানতে পেরেছে—ওই আলোর ফালির পিছনে পিছনে মানুষ রয়েছে চোখ ঠেকিয়ে। তার মানে অন্ধকারে বসেও অনেকে লক্ষ্য করছে নিশ্চয়। ওরা লক্ষ্য করছে। নজর রাখছে। ওরা সাক্ষী। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় চারজন অভিযুক্ত জ্বল্‌জ্বল্ করছে। দর্শকদের চোখের আড়ালে কিছু ঘটবে না। সাবাশ। এই তো চাই। আর এই মৃত্যু হারিয়ে যাবে না।

'রেডি'—অফিসারের কণ্ঠে দ্বিধা নেই। সঞ্জু আর তপনের চোখে চোখে কথা হলো। দর্শকরা সক্রিয় ভূমিকা নেবেনা এখন। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না—

মৃত্যুকে ওরা প্রতিবাদ ক'রে তুলল—'মাও সে তুঙ।'—তপনদা হাঁকলো।

'জিন্দাবাদ!' —সঞ্জু ও বিল্টু। আনন্দ সেই মুহূর্তে হাঁ করেছিল কিন্তু—বিল্টুও জিন্দাবাদে গলা মিলিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিলো সামনে—

রাইফেলের শব্দে বাতাস চিরে গেলো। সঞ্জু তপনদাকে ভেদ ক'রে বুলেট পৌঁছল দেওয়ালে।

রাইফেল আবার চেঁচিয়ে উঠলো। মাটি থেকে ধুলো উড়লো। ওরা নিশ্চল হয়ে যাবার পরেও বুড়ো পাঁচিলের গায়ে শিশু অশ্বত্থের পাতায় কাঁপন চলছিল।

আনন্দ আর কিছু বলার সুযোগ পেলনা।

বিণ্টু একটা সেপাইকে জাপটে ধরেছে। ধস্তাধস্তি। বিণ্টুর কপাে অফিসার রিভলবারের নল ঠেকাতেই আলিঙ্গনাবদ্ধ সেপাই আর্তনাদ ক'ে উঠল প্রাণভয়ে—'মর গিয়া'—

'যাও সে তুঙ'--অফিসারের অটোমেটিক বিণ্টুর শেষ কথাগুলো মুে দেবার পরেও যেন বিশ্বাস ক'রে থামতে পারছিল না।

কিন্তু ওদের বার্তা তো ওরা পৌঁছেই দিয়েছে। ওই টুকরো টুকরো আলোঃ ফালির কাছে।

ওই আলো ছড়িয়ে পড়বে। আর তার সঙ্গেই ছড়াবে বার্তা।